নজরুল স্মৃতি মাল্য

সম্পাদনা
হরিপদ ঘোষ

প্রাপ্তিস্থান :—
কামিনী প্রকাশালয়
১১৫, অখিল মিস্ত্রি লেন
কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্যামাপদ সরকার
১১৫, অখিল মিস্ত্রি লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ :
শুভ ১লা বৈশাখ, ১৩৬৭ সাল

প্রচ্ছদ :
শৈলেশ পাল

মুদ্রাকর :
সনাতন হাজরা
প্রভাবতী প্রেস
৬৭, শিশির ভাদুড়ী সরণী
কলিকাতা-৬

যাঁদের উদ্ধৃতি আছে

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

মোহিতলাল মজুমদার

ইন্দুবালা দেবী

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

প্রেমেন্দ্র মিত্র

সুভাষচন্দ্র বসু

বিপিনচন্দ্র পাল

প্রফুল্লচন্দ্র রায়

দিলীপকুমার রায়

ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়

মুকুর সর্বাধিকারী

মুজফ্‌ফর আহমদ

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

নলিনীকান্ত সরকার

গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

বিনয়কুমার সরকার

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

সুশীলকুমার গুপ্ত
মুহম্মদ হবীবুল্লাহ্ বাহার
কাজী আবদুল ওদুদ
প্রমথনাথ বিশী
নারায়ণ চৌধুরী
আব্বাসউদ্দীন আহ্‌মদ
মুহম্মদ আবদুল হাই
ইব্রাহিম খাঁ
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য
বেগম সুফিয়া কামাল
ফররুখ আহ্‌মদ
কাজী মোতাহার হোসেন
গোপাল ভৌমিক
রমা চৌধুরী
মঈনুদ্দিন
সৈয়দ মুজতবা আলী
প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়
গোলাম কুদ্দুস মজহুর

জীবনের প্রয়োজনে যুগের পরিবর্তন যেমন সত্য তেমনি যুগের প্রয়োজনেই জীবনেরও আবির্ভাব অমোঘ। এই বাস্তব সত্যটিকে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করার কাল এসেছে। তারই অভ্যাস অনুরণিত হচ্ছে দিকে দিকে। সাড়া জেগেছে সর্বহারার কণ্ঠে।

সর্বহারার কবি কাজী নজরুল ইসলাম। যারা বঞ্চিত, অবহেলিত, নিপীড়ন আর শোষণের জ্বালা যাদের বুকে ধিকিধিকি জ্বলে বুকেই জুড়িয়ে যাচ্ছিল দাহ, তাদের মূক বেদনারই ভাষা দিয়েছিলেন নজরুল। পদদলিত পরাধীন জাতির বুকে স্বাধীনতার তৃষ্ণা জাগিয়েই তিনি শান্ত থাকেননি, দেশের সমাজের বুক থেকে মানুষে মানুষে বিভেদ ব্যবধান দূর করবারও ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। তিনিই প্রথম কবি যিনি সমাজের সমাজপতিদের ছলনার মুখোস দেখিয়ে দিয়েছিলেন সকলের চোখে আঙুল দিয়ে। সেই সঙ্গে জলদমন্দ্র স্বরে বঞ্চিতের বেদনা আর অধিকারের দাবী ঘোষণা

করেছিলেন। এ কারণেই বলছিলাম, যুগের প্রয়োজনেই জীবনের আবির্ভাব ঘটে আর জীবনের প্রয়োজনেই যুগের পরিবর্তন হয়ে ওঠে অমোঘ। নজরুলের কণ্ঠস্বরের কণ্ঠ মিলিয়ে পরবর্তী যুগে তাঁর সার্থক উত্তরসাধক কিশোর কবি সুকান্তর কণ্ঠ সোচ্চার হয়েছে।

সর্বহারাদের কাল এসেছে—'ভাষাহীন মূক বঞ্চিত মানবের মুখে অধিকারের প্রত্যাশার বাণী উচ্চারিত হচ্ছে। দেশ ও সমাজ মানুষে মানুষে বিভেদের কালিমা মোচনের ব্রত গ্রহণ করেছে। নজরুলকে স্মরণ করবার, জানবার এই তো উপযুক্ত কাল। তাঁর কণ্ঠস্বর সকলের কণ্ঠে ধ্বনিত হবে, তাঁর দাবী সকলের দাবী হয়ে দিকে দিকে অনুরণিত হতে থাকবে এটাই এ যুগের দাবী। এভাবেই সার্থক হবে মানবপ্রেমিক বিদ্রোহী কবির স্বপ্ন-সাধ।

নজরুলের জীবন বহুমুখী। একের মধ্যে বহুর যে সার্থক সমন্বয়, নজরুলের জীবন তারই এক অনন্য দৃষ্টান্ত। তাই মানুষ নজরুলকেও আজকের দিনে জানার প্রয়োজন সর্বাধিক। তাহলেই তাঁর ব্রত রূপায়ণ সার্থক ও সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে।

নজরুলের জীবন সাহিত্য নিয়ে যে সকল মনীষী দীর্ঘকাল থেকে আলোচনা করে আসছেন তাঁদের রচনা থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করে এই মাল্য গ্রথিত হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস নজরুলের সামগ্রিক পরিচয় আমরা এই ক্ষুদ্র পরিসরে গ্রথিত করতে পেরেছি।

এই মাল্য ঘরে ঘরে পৌঁছে জনে জনে প্রীতিডোরে আবদ্ধ করুক এই আমাদের কামনা।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

নজরুল ধাপের পর ধাপ পরিশ্রম করে সাহিত্যের যশোর মন্দিরে এসে উপস্থিত হয়নি···যেদিন সে এলো, সে দিনই সে বিজয়ীর মতো এলো···কালবৈশাখীর অকস্মাৎ ঝড় যেমন হঠাৎ আসে অরণ্য উতলা করে পথঘূর্ণি তুলে, পথিকদের সন্ত্রস্ত সচকিত ক'রে গৃহস্থের টিনের চাল উড়িয়ে দিয়ে, ঝঞ্ঝার মঞ্জীর বাজিয়ে।

প্রচণ্ড মহীরুহ ভেঙে হুমড়ে ফেলে আনন্দের অট্টহাস্যে ঘোষণা করে, আমি এসেছি···তুমি যাও বা না যাও তাতে আমার কিছু যায় আসে না···বাংলার সমসাময়িক সাহিত্য ও সমাজে নজরুল ঠিক সেইভাবেই প্রবেশ করে, একদিন অকস্মাৎ ঝড়ের মতন, বিজয়ীর মতন। তাকে খুঁজে নিতে হয়নি তার আসন, সে এসে মহাঅভ্যাগতের মতন যেখানে বসেছে, সেখানেই তার আসন রচিত হয়েছে। সাহিত্য জগতে তার এই প্রবেশের সঙ্গে তার সমগ্র সাহিত্যিক জীবনের বিবর্তনই এক সুর ও এক ছন্দে গাঁথা।

কালবৈশাখী যেমন কোথা থেকে এলো কি করে এলো, আসতে না আসতেই কোথা থেকে নিয়ে এলো। এই প্রচণ্ড কালো মেঘের প্রমত্ত ছুটে চলা, তা যেমন কেউ জিজ্ঞাসা করবার সময় পায় না, কালবৈশাখী তার অস্তিত্বের প্রচণ্ড উল্লাসে কাউকে তা জিজ্ঞাসা করলে না, কোথা থেকে এলে, কি করে এলে, কি কোথায় কখন সংগ্রহ করলে এই প্রচণ্ড গতির সংবেদন···নজরুলও কাউকে সে অবকাশ দিলো না।

শুধু এইটুকু জানা গেলো, সে হাবিলদার··· যুদ্ধ ফেরত···নজরুল নিজে তার নামের মাঝে হাবিলদার কথাটিকে সংযুক্ত রাখতে ভালবাসতো। প্রথমে বিশ্ব-যুদ্ধে সে সব বাঙালী তরুণ যোদ্ধা হিসেবে যোগদান করেছিলো, নজরুল তাদেরই একজন···পল্টন ভেঙে দেওয়াতে তারা ফিরে এসেছে—পল্টন-জীবনের স্মৃতি নজরুল তখন নিজের অঙ্গে বহন করে বেড়াতো। তার বিচিত্র পোশাকের সঙ্গে পায়ে থাকতো মিলিটারী বুট···সে এক অদ্ভুত পোশাক···গেরুয়া রঙের চাদর···হাতে একখানা হাতপাখা···একরাশ এলো চুল···কাঁধ পর্যন্ত ঝুলছে দুলছে।

আমাদের সঙ্গে যখন পরিচয় হলো তখন আমাদের কাছেও নজরুল তার পূর্ব জীবনের কথা উল্লেখ করতো না···আমরাও শৈলজানন্দের কাছে যা শুনতাম, তাতে এইটুকু বুঝেছিলাম, নিদারুণ দুঃখের ভিতর দিয়ে তাকে এগিয়ে আসতে হয়েছে।

আমরা সবাই তখন জীবনের অবজ্ঞাত মধ্যবিত্ত স্তর থেকে এসেছি ···তাই আমাদেরই সগোত্র একজন বলে ধরে নিয়েছিলাম···পিছনের কথা জানবার কোনো প্রয়োজনই হতো না কারণ সামনে যাকে পেয়েছি, তার নতুনতত্বের বৈচিত্র্যই মনকে আচ্ছন্ন করে রাখতো··· নজরুল নিজেও নিজের সম্বন্ধে সেই কথাই বলতো, এই আমি···। এর বেশী জেনে কি লাভ ·

মোহিতলাল মজুমদার

কাজী সাহেবের কবিতায় কি কি দেখিলাম বলিব ? বাঙ্গলা কাব্যের যে অধুনাতন ছন্দ-ঝঙ্কার ও ধ্বনি-বৈচিত্র্যে এককালে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু অবশেষে নিরতিশয় পীড়িত হইয়া যে সুন্দরী মিথ্যারূপিণীর উপর বিরক্ত হইয়াছি, কাজী সাহেবের কবিতা পড়িয়া সেই ছন্দ-ঝঙ্কারে আবার আস্থা হইয়াছে। যে-ছন্দ কবিতায় শব্দার্থময়ী কাব্যভারতীর ভূষণ না হইয়া, প্রাণের আকুতি ও হৃদয়স্পন্দনের সহচর না হইয়া, ইদানীং কেবলমাত্র শ্রাবন-প্রীতিকর প্রাণহীন চারু-চাতুরীতে পর্যবসিত হইয়াছে, সেই ছন্দ এই নবিন কবির কবিতায় তাঁহার হৃদয়নিহিত ভাবের সহিত সুর মিলাইয়া মানবকণ্ঠের স্বর সপ্তকের সেবক হইয়াছে।

কাজী সাহেবে ছন্দ তাঁহার স্বতঃ উৎসারিত ভাব-কল্লোলিনীর অবশ্যাম্ভাবী গমনভঙ্গী।

ইন্দুবালা দেবী

চিৎপুরের বিষ্ণুভবন ছিলো আমাদের গ্রামোফোন কোম্পানীর রিহার্সাল ঘর। কাজীদা ছিলেন আমাদের বাংলা গানের ট্রেনার। কাজীদার ঘরে থাকতো সদাসর্বদাই নানা লোকের ভিড়। কাজের লোকই শুধু নয়, নানান অকাজের লোকও এসে ভিড় জমাতো। তা এজন্য তাঁকে বিরক্ত হতে কোনোদিন দেখিনি।

একদিন তাঁর ঘরে লোকজনের ভিড় ছিলো কম। কাজীদা তাঁর প্রিয় পান আর জর্দার কৌটো সামনে নিয়ে বসেছিলেন। মুখে একমুখ পান। সামনে খোলা থাকে গানের খাতা।

আমার পায়ের আওয়াজ পেয়ে তিনি মুখ তুলে তাকালেন। তারপর তাঁর নিজস্ব কায়দায় হা-হা করে হেসে উঠলেন। এমন হাসি, যা আমার মনে হয়েছে কাজীদা ছাড়া আর কেউ হাসতে পারবে না কোনোদিন। হাসতে হাসতে বললেন, 'আয় ইন্দু, বোস।' তারপর আমি তার পাশটিতে বসতেই বললেন, 'আচ্ছা, তোর ঐ 'অঞ্জলি লহো মোর সঙ্গীতে'-এর উল্টোপিঠের গানটা কি লিখি বলতো?'

আমি চট্ করে কোন জবাব দিলাম না। কাজীদা মহান কবি, শ্রেষ্ঠ গীতিকার। তাঁর এ কথার জবাব দিতে যাওয়া আমার মতো মানুষের মুর্খামি ছাড়া আর কি!

তাই একটুখানি চুপ করে থেকে শুধু বললাম, 'কাজীদা' এই গানটার সঙ্গে ঐ নতুন গানটাও যেন খুব ভাল হয়।'

কাজীদা আবার হা-হা করে সারা ঘর হাসিতে ভরিয়ে তুলে বললেন, 'আচ্ছা দাঁড়া, চুপটি করে বোস্।' বলে এক মুখ পান ঠেসে খস্ খস্ করে কাগজে লিখে দিলেন সেই আমার গাওয়া বিখ্যাত গানটি 'দোলা লাগিল দখিনার বনে বনে'।

কাজীদা এতো বড় ছিলেন, এতো মহান ছিলেন, তবু তিনি আমাদের সঙ্গে অনেক বিষয় নিয়ে বন্ধুর মতো আলোচনা করতেন। এমন কি, যে গানের জন্য তাঁর এতো খ্যাতি, দেশজোড়া নাম, সেই গানের বাণী তৈরীর সময়েও তিনি জিজ্ঞেস করতেন আমাদের মতামত।

কাজীদার একটি জিনিস দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে যেতাম। শুধু আমি কেন, আমার মতো অনেকেই হতো। রিহার্সাল ঘরে খুব হৈ-হুল্লোড় চলছে, নানা জনে করছে নানা রকম আলাচনা। কাজীদাও সকলের সঙ্গে হৈ-হুল্লোড় করছেন, হঠাৎ চুপ করে গেলেন। একধারে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন খানিক। অনেকে তাঁর এই ভাবান্তর লক্ষ্যই করলো না হয়তো কাজীদার সেদিকে খেয়াল

নেই। এতো গোলমালের মধ্যেও তিনি একটুক্ষণ ভেবে নিয়েই কাগজ কলম টেনে নিলেন। তারপর খস্-খস্ করে লিখে চললেন আপনমনে।

মাত্র আধঘণ্টা। কি তারও কম সময়ের মধ্যে পাঁচ-ছ' খানি গান লিখে পাঁচ-ছ'জনের হাতে-হাতে বিলি করে দিলেন। যেন মাথার মধ্যে তাঁর গানগুলি সাজানোই ছিলো, কাগজ কলম নিয়ে সেগুলো লিখে ফেলতেই যা দেরী।

কাজীদা এইরকম ভীড়ের মধ্যে, আর অল্প সময়ের মধ্যে এমন সুন্দর গান লিখতে পারতেন।

আর শুধু কি এই?

সঙ্গে সঙ্গে হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে সেই পাঁচ-ছ'জনকে সেই নতুন গান শিখিয়ে দিয়ে তবে রেহাই দিতেন তিনি। গান লেখার সাথে সাথে সুরও তৈরী করে ফেলতেন কাজীদা। অপূর্ব সব সুর। —যার তুলনা হয় না।

কাজীদা ছিলেন সুরের রাজা।

ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত

কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা দ্বারা বাংলা সাহিত্যে একটা নূতন সুর বাজিয়া উঠে। তিনি কবিতা ও প্রবন্ধ দ্বারা বাংলা সাহিত্যে নূতন ভাবধারা আনয়ন করেন। তাঁহার সাহিত্যের তিনটি যুগ আছে: প্রথমটি, জাতীয়তাপূর্ণ সাহিত্য। দ্বিতীয়, সাম্যবাদীয় সাহিত্য; তৃতীয়, তৎপরবর্তীকালের সাহিত্য, যাহা গজল প্রভৃতি গান প্রধান সাহিত্য।

তিনি বলিয়াছেন, অনেকেই প্রশ্নের পর প্রশ্ন করছেন, 'ধূমকেতু'র পথ কি ?···নীচে মোটামুটি 'ধূমকেতুর'র পথ নির্দেশ করছি। ···সর্ব প্রথম, 'ধূমতেতু' ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। স্বরাজ-টরাজ বুঝি না। কেননা ও কথাটার মানে এক-এক মহারথী এক-এক রকম করে থাকেন। পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে সকলের আগে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে, সকল কিছু নিয়ম-কানুন বাঁধন-শৃঙ্খলা মানা-নিষেধের বিরুদ্ধে। আর এই বিদ্রোহ করতে হলে—সকলেই আগে আপনাকে চিনতে হবে।' এই স্থলে কবির জাতীয়তাবাদীর রূপের পার্শ্বে সামাজিক-বিপ্লববাদীর রূপ প্রকাশ পায়।

সাধারণভাবে যাহাকে 'জাতীয়তাবাদ' বলে তাহা তাঁহার লক্ষ্য নয়। তাঁহার এই আদর্শ 'ভারত ভারতবাসীর জন্য' এই বুলিতে পর্যবসিত হয় নাই। তাঁহার লক্ষ্য মানবের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি। এই জন্য তিনি কেবল রাজনীতিক পরিবর্তন চান নাই, সমাজকেও সম্পূর্ণ-ভাবে পরিবর্তিত করিতে চাহিয়াছেন।

এক সময় বোধ হয় তিনি কোনো কোনো ভূতপূর্ব বৈপ্লবিকের সহিত পরিচিত হন এবং তাঁহাদের অতীত কার্যের কাহিনী শ্রবণ করেন। এই সময়েই ৺শরৎচন্দ্র চট্টোপাধায়ের 'পথের দাবী' প্রকাশিত হয়। এই সময়েরই পুস্তক হইতেছে কবির 'কুহেলিকা'। এই পুস্তক অতি উচ্চ স্তরের সাহিত্য। এই নভেলে লেখক তথাকথিত হিন্দু সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিকের সহিত মুসলমান যুবকেরও দেশপ্রেমজনিত ত্যাগের অতি উচ্চাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। 'প্রমতৎদা'র নেতৃত্বে দেশের স্বাধীনতার জন্য জমিদার-পুত্র জাহাঙ্গীর প্রাণ বিসর্জন পর্যন্ত করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প ও শেষে দ্বীপান্তর গমন, এই বর্ণনা গঙ্গা ও যমুনার মিলনের ন্যায় সুমহান হইয়াছে।

এই পুস্তকে কবি ভারতবর্ষ ও জাতীয়তাবাদের প্রচলিত অর্থের ঊর্ধ্বে উঠিয়াছেন। তাই তিনি বৈপ্লবিক নেতা প্রথমের মুখ দিয়া বলিতেছেন, 'আমার ভারত ও মানচিত্রের ভারতবর্ষ নয় রে অনিম। আমাব ভারতবর্ষ, ভারতের এই মুক দরিদ্র নিরন্ন পর-পদ-দলিত তেত্রিশ কোটি মানুষের ভারতবর্ষ। আমার ভারতবর্ষ মানুষের যুগে যুগে পীড়িত মানবাত্মার ক্রন্দনতীর্থ; ওরে, এ ভারতবর্ষ তোদের মন্দিরের ভারতবর্ষ নয়, মুসলমানের মস্‌জিদের ভারতবর্ষ নয়—এ আমার মানুষের—মহামানুষের মহা-ভারত।'

নিরন্ন পদ-দলিত, শোষিত লোকদেরই নিয়া যে ভারতবর্ষ, তাহা পরের যুগের কবির সাহিত্য আরও পরিস্ফট হয়। এই সময়ে কবিকে শোষিত সর্বহারাদের প্রতিভু রূপে দেখিতে পাই। তাঁহার বীণার নূতন ঝঙ্কার ধ্বনিত হয়! তাই তিনি বলিতেছেন:

'সাম্যের গান গাই—

আমার চক্ষে পুরুষ রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।'

পুনঃ, এইরূপে তিনি 'কৃষাণের গান,' 'ধীবরের গান,' 'শ্রমিকের গান, 'সাম্যবাদের গান, 'মানুষের গান' প্রভৃতি—গান তখনকার নব প্রতিত 'লাঙ্গল' পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। এই সব গানে তিনি গণশ্রেণীদের দুঃখের কথা, তাহাদের উপর উচ্চশ্রেণীদের শোষণের কথা ওজস্বিনী ভাষার বর্ণনা করিয়াছেন। এই সব গানগুলি আজ সারা বাংলার সম্পত্তি হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, তিনি বুর্জোয়া সমাজের মাপকাঠি দ্বারা পাপ-পুণ্যের বিচার করাকে ঘৃণা করিয়াই বলিয়াছেন:

'যত পাপীতাপী সব মোর বোন, সব হয় মোর ভাই
অন্যের পাপ গণিবার আগে নিজেদের পাপ গোনো।'

এই তর্ক ধরিয়াই তিনি আবার চোর-ডাকাতকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন:

'কে তোমায় বলে ডাকাত বন্ধু, কে তোমায় চোর বলে ?
চারিদিকে বাজে ডাকাতি ডঙ্কা, চোরেরি রাজ্যে চলে।
ছোটদের সব চুরি করে আজ বড়রা হয়েছে বড়।
যারা যত বড় ডাকাত দস্যু, দাগাবাজ,
তারা তত বড় সন্ন্যাসী গুণী-জাতি-সঙ্ঘেতে আজ।'

এই সময়ে সাম্যের গান গাহিবার কালে তিনি গাহিয়াছেন ঃ

'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই নহে কিছু মহীয়ান।
যাহারা আনিল গ্রন্থ কেতাব
সেই মানুষের মেরে পুজিছে গ্রন্থ ভণ্ডের দল।
মূর্খরা সব শোনো, মানুষ এনেছে গ্রন্থ,
গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো।'

এই স্থলে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষার বড় কবি চণ্ডীদাসের সেই অমর বাণী 'শুনহে মানুষ ভাই সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপর নাই, তাহারই প্রতিধ্বনি পাই। চণ্ডীদাসের প্রায় ছয় শত বৎসর পরে বাংলা সাহিত্যে আবার সেই ধ্বনি উত্থিত হয়। আর আশ্চর্যের কথা, উভয় কবিই বীরভূমের মাটিতে উৎপন্ন। চণ্ডীদাসের সময়ের পর, বাংলা সাহিত্যের কত পরিবর্তত সাধিত হইয়াছে ; কত ভাব-বন্যার স্রোত তাহাতে আসিয়াছে, কিন্তু বর্তমানের গণসমুহের কবি নজরুল ইসলাম যে নূতন রূপ সাহিত্যে প্রদান করিয়াছেন তাহা অতুলনীয় ও চিরস্মরণীয় থাকিবে।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

চওড়া বুকের ছাতি, বড়ো বড়ো চোখ, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সুন্দর দেহ। মাথার চুলগুলো কিছুতেই বাগ মানাছে না—এই নজরুল! আমার মাথার চুল খুব সুন্দর। কেমন ক'রে সুন্দর হলো বুঝতে পারি না। লোকে ভাবে, বুঝি মাথায় বড়ো বড়ো বাবরি চুল আমি সখ করে রেয়েছি। কিন্তু তা নয়। চুল কাটবার পয়সা না, এমন কি আঁচড়াবার একটা চিরুনি পর্যন্ত নেই।

নজরুল বলে, 'তোমার অমনি চুল কেমন ক'রে হলো তাই বলো',

আমরা তখন পনেরো ষোল বছরের কিশোর বালক। রাণীগঞ্জে থাকি। দু'জন দুটো ইস্কুলে পড়ি, কিন্তু থাকি খুব কাছাকাছি। এক পুকুরে স্নান করি, সাঁতার কাটি, আম, জাম, কামারাঙা গাছ থেকে পেড়ে নুন দিয়ে দিয়ে খাই, একসঙ্গে বেড়াতে যাই, সুখ-দুঃখের গল্প করি। অন্য বন্ধু আছে অনেক। তাদের ভেতর একমাত্র ক্রিশ্চান বন্ধু শৈলেন ছাড়া আর কেউ বড়ো একটা আমাদের সঙ্গে মেশে না। আমাদের জগৎ যেন সম্পূর্ণ আলাদা।

নজরুল ছোটো ছোটো গল্প আমাকে শোনায়।

নজরুল ছোটো ছোটো গল্প লেখে, আমাকে শোনায়। আমি কবিতা লিখি—নজরুলকে শোনাই। আর কাউকে শোনাতে ইচ্ছে করে না! শোনালে বিশ্বাস করে না। বলে, ও আমাদের নিজের লেখা নয়। কোথাও থেকে চুরি করেছি।

একমাত্র শৈলেন শোনে মাঝে-মাঝে। শোনে আর ফিক্ ফিক্ ক'রে হাসে। বলে, 'ওগুলো ছিঁড়ে ফেলে দাও। কিছু হয়নি।'

আমাকে রাগায়। বলে, 'ওই জন্যই বুঝি চুল রেখেছো? চুল রাখলেই কবি হয় না!

নজরুলকে বলে, 'তুমি গদ্য লিখে কোনোদিন বঙ্কিমচন্দ্র হবে না। এই আমি, ব'লে রাখছি।'

শৈলেনের কথায় আমরা রাগ করতাম না। শৈলেন ছিলো আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু। সে আজ আর ইহজগতে নেই।

কিন্তু যাবার আগে সে দেখে গেছে—আমরা আমাদেব পেশা বদলে নিয়েছি! আমি লিখছি গল্প, নজরুল কবিতা।

মাঝখানে কিছুদিনের জন্য নজরুল ছিলো করাচিতে।

শৈলেন আর আমি সেই ফাঁকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ ক'রে কলকাতায় এসেছি।

নজরুল এলো করাচি থেকে। হলো সৈনিক-কবি।

তার কবিখ্যাত ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। গান লিখছে, গান গাইছে, সভায় সমিতিতে, বড়ীর আড্ডায়, ছেলেদের হোস্টেলে নজরুলকে নিয়ে টানাটানি চলছে। তার মুহূর্তের অবসর নেই।

আমাদের দেখে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। আড্ডা ছেড়ে পালিয়ে আসে।

সেখানে সদ্য-পরিচিত স্তাবক আর অনুরাগীর দল। মার্জিত রুচি শিক্ষিত মানুষের মজলিস। সংখ্যায় অগণ্য।

আর এখানে আমরা নগণ্য মাত্র তিনজন। নজরুল, আমি আর শৈলেন!

আবার যেন আমরা সেই পুরোনো দিনে ফিরে যাই। এখানে কবি ব'লে নজরুলের আলাদা কোনও সম্মান নেই। সবাই এখানে অবারিত, অনর্গল এবং নিরাভরণ। শান্তিপুরী পোশাকী ভাষায় কথা বলা তখনও ভালো রপ্ত হয়নি। আমাদের জন্মভূমি সেই রাঢ় অঞ্চলের প্রখর চলিত মাতৃভাষায় প্রাণখুলে কথা ব'লে আর হো-হো করে হাসে।

এমন সব কথা, এমন সব গল্প, যা ওখানে বলা চলে না, নজরুল এখানে তাই বলে। যে গানটি তার সবচেয়ে প্রিয় সেই গানটি

শোনায়। যে কবিতাটি সবে লিখেছে সেই কবিতাটি আবৃত্তি করে।

শৈলেন বলে, 'যাক্, এতদিন পরে আমার কথাটা আমি withdraw ক'রে নিলাম। তবে withdraw করার দরকার হতো না যদি না তোমাদের লেখা তুটো তোমরা পালটা-পালটি ক'রে নিতে। তুমি যদি গল্প লিখতে, আর শৈলজা যদি কবিতা লিখতো তাহলে তোমরা তুজনেই মরতে।'

আমি বললাম, 'নজরুল এখনই-বা বেঁচে আছে কোথায়? সবাই হৈ-হৈ করছে, টানাটানি করছে, বলছে—গান গাও, কবিতা শোনাও। বাহবা দিচ্ছে, প্রশংসা করছে।···কিন্তু কি খেয়ে কেমন করে ও বেঁচে আছে সেদিকটা কেউ দেখছে না। একটা পয়সা আসছে না কোথাও থেকে। কি কষ্টে যে ওর দিন চলছে তা আমি জানি। যে গল্প-গুলো ও লিখেছিলো তার কপিরাইট বেচার জন্যে বসে আছে। তাও তো আফজল্ বলছে একশো টাকার বেশি দেবে না।'

এই কথাগুলো কেউ শোনে, নজরুল তা পছন্দ করে না। হে-হে ক'রে হাসে সে অর্গ্যানের সুর তুলে আমার কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা করে।

আমি তিরস্কার করলাম নজরুলকে—হে-হে ক'রে হাসছে দেখো। যারা তু'পেয়ালা চা খাইয়ে সারাদিন তোমাকে গাধার মত খাটিয়ে নেয় তাদের বলতে পারো না?'

নজরুল বলে, 'তাদের কি বলবো? আচ্ছা বোকা তো!

'তাদের বলবে তুমি যাবে না, তোমাকে লিখতে হবে। টাকার দরকার। তুটো কবিতা লিখলে কুড়িটা টাকা তো পাবে?'

শৈলেন বললে, 'ও বলবে, তবেই হয়েছে। টাকার কথা ও কখ্খনো বলতে পারবে না। মাথার চুলের তুঃখু ছিলো ওর চিরকাল। এখন চুলগুলো বাগিয়েছে, কবি-কবি চেহারা হয়েছে, ব্যাস, ওতেই খুশি।'

নজরুল চুলের প্রশংসায় ভারি খুশি। বললে, 'শৈলজার মতো হয়েছে ?'

আমি বললাম, 'আমি এবার চুলগুলো কেটে ফেলবো কিন্তু।'

নজরুলের খুব আপত্তি !—'না না কাটবে না।'

শৈলেন বলেছিলো, 'তা না হয় কাটব না। কিন্তু তোমাকে একটি কাজ করতে হবে। তোমার ওই চুলগুলোকে জটা ক'রে ফেলতে হবে। তারপর সারা গায়ে ছাই মেখে হিমালয়ে গিয়ে বসে থাকবে। ত্রিশূল একটা আমি তৈরি করিয়ে দেবো। সত্যি বলছি, দোহাই তোমার, মহাদেব হবার চেষ্টা করো না। সব ব্যাটা সমুদ্র মন্থন ক'রে অমৃতটুকু লুটে নিয়ে তোমার হাতে তুলে দেবে বিষ। সেই বিষ খেয়ে নীলকণ্ঠ হয়ে বসে থেকো না। আমরা সহ্য করতে পারবো না।'

নজরুলকে নিয়ে এমনি রসিকতা করতো শৈলেন।

নজরুল হো-হো ক'রে হাসতো আর বলতো, 'আমি হবো না, হবো না, হবো না তাপস, না পাই তপস্বিনী। মহাদেব হবো কেমন করে ? পার্বতী কোথায় পাবো ?'

শৈলেন বলতো, 'বাবুদের অন্দরমহল থেকে যেরকম ঘনঘন ডাক আসছে তোমার—পার্বতী একটি জুটে যাবে ঠিক।'

আমি কিন্তু বিশ্বাস করতে পারিনি।

বীরভোগ্য বসুন্ধরা !

সে যে চায় না কিছুই। যে চায় না সে পায় না।

নজরুল চেয়েছিলো শুধু আনন্দ। সে তার অন্তরের ভিতর থেকে স্বতঃউৎসারিত পরমানন্দ। টাকা নয়, পয়সা নয়, ক্ষুধায় অন্ন নয়, পার্থিব কোন সম্পদ নয়, সুর-সুন্দরের কাছ থেকে সে আনন্দ তার অপনি আসে। সেই আনন্দে সে দিন-রাত মশগুল হয়ে থাকে।

'আপন গন্ধে ফিরি মাতোয়ারা কস্তুরীমৃগ সম !'

সেদিন তার খাবার সময় আমি তার আস্তানায় গিয়ে পড়েছিলাম।

বাইরে কয়েকজন ছোকরা দাঁড়িয়ে আছে ; তাকে কোথায় যেন নিয়ে যাবে। শেয়ালদা স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরতে হবে।

খেতে বসবার আগে নজরুল আমাকে বললে, 'খাবে ?'

আমি বললাম, 'না।'

কাছে গিয়ে দেখলাম কাঁচের একটি ডিসের উপর কয়েক মুঠো ভাত, একটি প্লেটের উপর তিন টুকরো মাংস আর একটুখানি ঝোল।

যে দুটো ডেকচিতে রান্না হয়েছিলো সে দুটো খালি পড়ে রয়েছে। তাতে আর অবশিষ্ট কিছু নেই।

বিশ-পঁচিশ বছরের যে ছোকরাটি রান্না করে সে এক গ্লাস জল এনে নামিয়ে দিলে নজরুলের হাতের কাছে।

জিজ্ঞাস করলাম, 'তুমি খাবে না ? নেই তো কিছু।'

লোকটি বললে, 'আমি হোটেলে খেয়ে নেবো।'

নজরুল ব'লে উঠলো, 'কেন, হোটেলে খাবে কেন ?'

লোকটি বললে, 'আপনি তখন আপনার বন্ধুকে খাইয়ে দিলেন যে !'

এতক্ষণে মনে পড়ল নজরুলের। বললে, 'ধেৎ, সে আমার বন্ধু কেন হবে ? সে এসেছিলো আমার কাছে টাকা ধার করতে।' আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললে, 'আমার নাম-টাম শুনে লোকটা ভেবেছে আমার মেলা টাকা।'

—'তাই বুঝি তাকে খাইয়ে বিদায় করলে ?'

নজরুল বললে, না না, দেখলাম বেচারার মুখখানি শুকিয়ে গেছে। বললে, 'দু'দিন ভাত খাইনি।'

বললাম, 'তাকেই তো পয়সা দিয়ে হোটেলে পাঠাতে পারতে ?'

নজরুল বললে, 'দশ টাকার নোট একটি নোট ছাড়া আমার কাছে কিছু ছিল না যে ! টাকা পয়সাগুলো আমার কাছে আসতেও চায় না, থাকতেও চায় না। আমার সঙ্গে কী শত্রুতা যে আছে তাদের কে জানে।'

—'সেই দশ টাকার নোটটি তাকে দিলে বুঝি?'

নজরুল বললে 'হুঁ। ভারি লজ্জা করছিলো। চেয়েছিলো একশো টাকা, দিলাম মাত্র দশটি টাকা।'

রাঁধুনি ছোক্‌রাটি দাঁড়িয়েছিলো একটু দূরে। তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে বললাম, 'এখন ওকে কি দেবে দাও।'

নজরুল নিতান্ত অসহায়ের মতো তাকালো আমার দিকে।

একটি টাকা সেই ছোক্‌রাকে আমি দিতে গেলাম। সে নিলে না কিছুতেই। বললে, টাকা আছে আমার কাছে।

নজরুলের মুখে হাসি ফুটলো।—'এই দেখো, সবাইকার কাছে টাকা থাকে আমার কাছে থাকে না।'

ছোক্‌রাটি বললে, হোটেলে আমাকে যেতে হত না, যা রান্না করেছিলাম ওতেই কুলিয়ে যেতো, কিন্তু তিনজনের খাবার লোকটা একাই খেয়ে ফেললে।'

নজরুল ধমক দিয়ে।—'ধেৎ, ওরকম করে বলতে নেই। আমি ওর মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম বেচারীর খুব খিদে পেয়েছিলো। খেয়েছে বেশ করেছে।'

খাওয়া শেষ করে হাত-কাটা ফতুয়ার উপর বাসন্তী রঙের চাদরটি গায়ে দিয়ে চটি পরে পান চিবোতে চিবোতে বেরিয়ে যাচ্ছিল নজরুল, আমাকে বললে, 'চলো, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যাই।'

বললাম, 'খুব হয়েছে। তুমি যাবে পশ্চিমে, আমি যাবো পুবে।'

নজরুল বললে, 'গাড়ী এনেছো তো! মোটরকার?'

মোটরকার এলে আর রক্ষে নেই! যেখানে খুশি তাকে নিয়ে যেতে পারবো।

পাড়াগাঁয়ের ছেলে নজরুল—এই মোটরে চড়ার সখটা তার গেল না। কিছুতেই মোটরে চড়িয়ে কেউ যদি ওকে জাহান্নামে নিয়ে যায় তো তক্ষুনি যেতে রাজী হয়ে যাবে।

একদিন হয়েছে কি, বিকালে শৈলেনদের বিডন ষ্ট্রীটের বাড়িতে

বসে বসে গল্প করছি শৈলেনদের সঙ্গে. এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে নজরুল ঢুকলো আমাদের কাছে হাত পেতে বললে, 'চারটে টাকা দাও। বাইরে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে।'

রাস্তায় গিয়ে দেখলাম. ট্যাক্সির ভাড়া উঠেছে পাঁচ টাকা। নজরুলের পকেট ছিলো মাত্র একটি টাকা। সেই টাকাটি ড্রাইভারের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলেছে, 'টাকা আনছি, তুমি দাঁড়াও।'

ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে শৈলেন বললে. 'এই টাকাটা তোমাকে আমি ধার দিলাম। ফিরিয়ে দিয়ে যেয়ো। যদি না দাও, তো তোমার গলায় গামছা দিয়ে আদায় কড়বো।'

আর সেই প্রাণখোলা হাসি হাসতে হাসতে নজরুল এসে বসলো তার নিজের জায়গায়। মানে অর্গ্যানের সামনে। বললে, 'তুমি তো খৃষ্টান ছিলে, হিন্দু হলে কবে ?

শৈলেন বললে, 'হয়েছি তোমার জন্যে।'

—'তা বেশ করেছো। সেই রাণীগঞ্জ থেকে ধরলে অনেক টাকা তুমি পাবে আমার কাছ থেকে। হিসেব করে রেখো। আপাততঃ দু'পেয়ালা চা দাও।'

শৈলেন জিজ্ঞেস করলে. 'দু'পেয়ালা কেন ?

নজরুল বললে, লাখ পেয়ালা চা না খেলে চালাক হয় না। লাখ পেয়ালা হতে আমার এখনও দু'পেয়ালা বাকি আছে।

শৈলেন বলেছিলো. 'লাখ পেয়ালা চা খেয়ে চালাক তুমি হবে কিনা জানি না; কিন্তু মদ্যপান যদি করতে পারো তো নিঘ্ঘাৎ মাইকেল মধুসূদন হয়ে যাবে—সে কথা আমি হলপ করে বলতে পারি।

আমার দুর্ভাগ্য শৈলেন অনেকদিন হলো আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। নজরুল আজ সত্তর বছরের বৃদ্ধ! সারাজীবনে যে মদ্যপান দূরের কথা, ধূমপান পর্যন্ত করলে না। কাজেই সে মাইকেল হলো কিনা শৈলেন দেখে যেতে পারলে না।

কিন্তু যা সে হয়েছে তাই-বা ক'জন হতে পারে?

যা সে পেয়েছে তাই-বা কজন পায়?

কবি এবং গীতিকার নজরুল সর্বজন শ্রদ্ধেয়। তাই দেশবাসীর কাছ থেকে পেয়েছে সে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা আর প্রণতি।

একদিন জীবন দেবতার কাছ থেকে পেয়েছে সে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ আর অপরিমাণ যন্ত্রণা।

কবি নজরুলের চেয়ে মানুষ নজরুল অনেক—অনেক বড়। শিশুর মতো সরল, নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, নিরহঙ্কার, এমন অজাতশত্রু হৃদয়বান এবং অনন্দময় পুরুষ এ যুগে সচরাচর দেখা যায় না।

শৈলেন, একদিন হাসি-রহস্য করে বলেছিলো তুমি মহাদেব সেজে ছাই মেখে বোম্ বোম্ করে পথে পথে ঘুরে বেড়াও।'

আজ শৈলেনের সেই কথাটা মনে পড়ছে। বলেছিলো, 'সমুদ্র মন্থনের অমৃতটুকু নিজেরা নিয়ে বিষটুকু তুলে দেবে তোমার হাতে। সেই বিষ খেয়ে নীলকণ্ঠ হয়ে বসে থাকবে।

তাই হয়েছে। আজ শৈলেন নেই, কিন্তু তার কথাটা সত্য হয়ে গেছে। নজরুল নীলকণ্ঠ হয়ে ধ্যানমগ্ন অপস্বীর মতো চুপ করে বসে আছে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যের জগতে ছন্দোময় এক দুরন্ত ঝটিকা-বেগ। ঝটিকায় যা ধর্ম নজরুল ইসলামের কাব্য-প্রতিভায় মধ্যে তার সব কিছুই বর্তমান উচ্ছৃঙ্খল বাত্যার মতই তা সাহিত্যের আকাশে দেখা দিয়েছে, যা নড়বড়ে তাকে নাড়া দিয়ে ভেঙেছে, যা জীর্ণ তাকে ছিন্নভিন্ন করে দিগ্বিদিকে দিয়েছে উড়িয়ে যার যেখানে অন্যায় অসত্য শিকড় গেড়ে বসেছে সুস্থ বলিষ্ঠ জীবনের কণ্ঠরোধ

করে, সেখানে আঘাতের পর আঘাত মূল পর্যন্ত দিয়েছে টলিয়ে। পূর্বের কিছু কিছু রচনা রসিকজনকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও 'বিদ্রোহী' কবিতাতেই নজরুল ইসলাম সমস্ত সাহিত্য জগতের কাছে সচকিত স্বীকৃতি যেন সবলে আদায় করে নেন।

কাব্য বিচার 'বিদ্রোহী'র মূল্য সকলের কাছে সমান না হতে পারে, কিন্তু তদানীন্তন যুগ-মানস যে প্রথম এই কবিতার মধ্যেই প্রতিবিম্বিত এ-কথা কেউ বোধহয় অস্বীকার করবেন না। এ কবিতার বিশৃঙ্খল ছন্দ ও উগ্র উৎকট উপমা উৎপ্রেক্ষাও যেন সে যুগের অন্তরলোকের নিরুদ্ধ বাষ্পবেগের দ্বারা উৎক্ষিপ্ত।

'বিদ্রোহী' কবিতার মধ্যে দিয়েই নজরুল ইসলামের প্রতিষ্ঠা এবং তাঁর সমস্ত জীবন ও কাব্য-সাধনার মধ্যে দিয়ে বিদ্রোহের প্রেরণাই প্রবল হলেও শুধু 'বিদ্রোহী' কবিতার মধ্যে দিয়ে তাঁকে চিনতে চাইল তাঁর প্রতি একান্ত অবিচার করা হবে বলে মনে হয়। নজরুল ইসলাম চির-বিদ্রোহী সত্তা, কিন্তু সে বিদ্রোহের আসল পরিচয় উগ্র উচ্ছ্বাসে নয়। সমস্ত উদ্দাম তরঙ্গ-আন্দোলনের তলায় কোথায় সে বিদ্রোহ যেন গভীর সমুদ্রের মতো শান্ত, সমস্ত ঝটিকা-আন্দোলনের উর্ধ্বে তুষার শিখরের মতো স্থির।

সমস্ত উন্মত্ত বেগের পিছনে এই প্রসন্ন প্রশান্তি ও ধৈর্য না থাকলে প্রাকৃতিক ঝটিকার মতই নজরুল ইসলামের নাম বাংলা কাব্য-সাহিত্যের চিরন্তন গৌরব না হয়ে শুধু সাময়িক দুর্যোগের স্মৃতি হয়েই থাকত।

সুভাষচন্দ্র বসু

কবি নজরুল যুদ্ধের ঘটনা নিয়ে কবিতা লিখেছেন। কবি নিজে বন্দুক ঘাড়ে করে যুদ্ধ করেছিলেন, কজেই নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সব কথা লিখেছেন তিনি। আমাদের দেশে ঐরূপ ঘটনা খুব কম, ··অন্য স্বাধীন দেশে খুব বেশী! এতেই বুঝা যায় যে. নজরুল একটা জীবন্ত মানুষ।

কারাগারে আমরা অনেকে যাই, কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে সেই জেল-জীবনের প্রভাব কমই দেখতে পাই। তার কারণ অনুভূতি কম। কিন্তু নজরুল যে জেলে গিয়েছিলেন, তার প্রমাণ তাঁর লেখার মধ্যে অনেক স্থানে পাওয়া যায়। এতেও বুঝা যায় যে, তিনি একটি জ্যান্ত মানুষ।

তাঁর লেখার প্রভাব অসাধারণ। তাঁর গান পড়ে আমার মতো বে-রসিক লোকেরও জেলে বসে গাইবার ইচ্ছা হতো। আমাদের প্রাণ নেই, তাই আমরা এমন প্রাণময় কবিতা লিখিতে পাি না।

নজরুলকে 'বিদ্রোহী' কবি বলা হয় এটা সত্য কথা। তাঁর অন্তরটা যে বিদ্রোহী, তা স্পষ্টই বুঝা যায়। আমরা যখন যুদ্ধে যাবো তখন :সেখানে নজরুলের যুদ্ধের গান গাওয়া হবে। আমরা যখন কারাগারে যাবো, তখনও তাঁর গান গাইবো!

আমি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সর্বদাই ঘুরে বেড়াই। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় জাতীয় সঙ্গীত শুনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে! কিন্তু নজরুলে 'দুর্গমগিরি কান্তার মরুর মতো প্রাণমাতানো গান কোথাও শুনেছি বলে মনে হয় না।

কবি নজরুল যে-স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেটা শুধু তাঁর নিজের স্বপ্ন নয়—সমগ্র বাঙালী জাতির স্বপ্ন।

বিপিনচন্দ্র পাল

…নজরুল ইসলাম কোথায় জন্মিয়াছেন জানি না; কিন্তু তাঁহার কবিতায় গ্রামের ছন্দ, মাটির গন্ধ পাই। দেশের যে নূতন ভাব জন্মিয়াছে তাহার সুর পাই। তাহাতে পালিশ নাই, আছে লাঙ্গলের গান, কৃষকের গান।…মানুষ মানুষে একাত্মসাধনও অতি লোকেই করিয়াছে।

প্রফুল্লচন্দ্র রায়

নজরুল কবি—প্রতিভাবান মৌলিক কবি। রবীন্দ্রনাথের আওতায় নজরুলের প্রতিভা পরিপুষ্ট হয়নি। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কবি বলে স্বীকার করেছেন।

নজরুল ইসলাম শুধু মুসলমান কবি নন, তিনি বাঙলার কবি, জাতি তাঁকে শুধু বাঙালীরূপেই পেয়েছিল। আজ নজরুল ইসলামকেও জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। কবিরা সাধারণতঃ কোমল ও ভীরু, কিন্তু নজরুল তা নন। কারাগারে শৃঙ্খল পরে বুকের রক্ত দিয়ে তিনি যা লিখেছেন, তা বাঙালীর প্রাণে এক নূতন স্পন্দন জাগিয়ে তুলেছে।

দিলীপকুমার রায়

মনে পড়ে তার দিলদরিয়া প্রাণের কথা। এমন প্রাণ নিয়ে খুব কম মানুষই জন্মায়। মজলিসি সভাসদ, হাসিগল্পের নায়ক, ভাবালু গায়ক, বলিষ্ঠ আবৃত্তিকার, বিশিষ্ট সুরকার, গুণীর গুণগ্রাহী, উদার সরল মানুষ—সে রেখে ঢেকে কথা কইতে জানত না—যখনই

আমাদের সভায়-আসরে আসত, আসত ছুটে, হেঁটে নয়—অট্টহাস্যে ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে, এসেই জড়িয়ে ধরত 'দিলীপদা বলে—এমন মানুষ কটাই বা জীবনে দেখেছি ?

এক সময়ে আমি তার নানা গানই গাইতাম, বিশেষ ক'রে প্রেমের গান, যথা, বাগিচায় বুলবুলি তুব ফুল শাখাতে দিস্‌নে আজি দোল, বসিয়া বিজনে কেন একা মনে, পানিয়া ভবনে চললো গৌরী, এত জল ও কাজল চোখে কেন কাঁদে পরাণ কি বেদনায় কারে কহি, চেও না আর যেও না সুনয়না এ-নয়ন পানে, কেন দিলে এ-কাঁটা যদি গো কুসুম দিলে, কে বিদেশী মন উদাসী বাঁশের বাঁশি বাজাও বনে, নিশি ভোর হল জাগিয়া পরাণপিয়া, আমাকে চোখ ইশারায় ডাক দিল হায় কে গো দরদী, করুণ যেন অরুণ-আঁখি, গরজে গম্ভীর গগনে কম্বু প্রভৃতি। এগুলির মধ্যে কয়েকটি কাজী নিজের হাতেই আমার খাতায় লিখে দিয়েছিল—সে খাতাটি আজো আছে !

তার সঙ্গে আমার আর একটি মস্ত মিল ছিল এইখানে যে, সে তার গান সুরবিহারের স্বাধীনতা আমাকে সানন্দই দিত, যেমন দিতেন আমার পিতৃদেব ও অতুলপ্রসাদ। এ নিয়ে কবিগুরুর সঙ্গে আমার মতভেদ কাজী ও অতুলপ্রসাদ বরাবরই ছিলেন আমার দিকে। তাই তো 'বুলবুল'-এর উৎসর্গে কাজী আমাকে লিখেছিল ঃ

যে গান গেয়েছি একাকী নিশীথে কুসুমের কানে কানে,
ওগো গুণী, তুমি জড়ালে তাহারে সব বুকে, সবখানে।
বুকে বুকে আজ পেল আশ্রয় আমার নীড়ের পাখী,
মুক্ত পক্ষ উড়িতে যে চায় কেন তারে বেঁধে রাখি ?

সে গুণী ছিল তাই বুঝত যে মুক্তপক্ষ সুরকে স্বর লিপির কাঠামোতে বেঁধে রাখলে তাই গগনবিহার ব্যাহত হয়ই হয়। আজ শুনি একদল অগায়ক ক্রিটিকের মুখে যে এ স্বাধীনতা অক্ষমনীয় কিন্তু অতুলপ্রসাদ ও কাজীর অনুমতি পাওয়ার পরে এসব রক্ষক্রিটিকদের মাথা-নাড়া উপেক্ষা করা চলে। কাজী আমার মুখে

তার গানের নানা সুরবিহারে বিশেষ উৎফুল্ল হয়েছিল। সে তার 'বুলবুল' কাব্য গ্রন্থটির প্রথম ভাগ আমাকে উৎসর্গ করে। সে-যুগে আমার বাংলা গানের পাঁচটি ধারা ছিল: পিতৃদেব দ্বিজেন্দ্রলালের, অতুলপ্রসাদের, রজনীকান্তের. কাজীর ও আমার নিজের। পণ্ডিচেরী চলে আসার আগে আমি সবচেয়ে বেশি গাইতাম অতুলপ্রসাদ ও কাজীর গান। মনে পড়ে কত আসরে এ-দুই সুরকারকেই এক সঙ্গে শুনিয়েছি তাঁদেরই রচিত গান। এ-সৌভাগ্য কজন গায়কের হয়েছে জানি না। তবে যাঁদের হয়েছে তাঁদের কাছে এ-স্মৃতি থাকতেই অনপমেয়—বিশেষ ক'রে কই জন্যে যে অতুলপ্রসাদ ও কাজী শুধু গায়কই ছিলেন না, ছিলেন শ্রোতা তথা সমজদার

কাজীর গান! সে একটা যুগ গেছে। মনে পড়ে—রামমোহন লাইব্রেরীতে সুভাষ ও দেশবন্ধুর পদার্পণ। তার পরেই কাজীর আবির্ভাব ও ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে পাওয়া:

এই শিকল পরা ছল মোদের এই শিকল পরা ছল,
এহ শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল।

রামমোহন লাইব্রেরীতে ওভারটুন হলে ও ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুটে আমি মাঝে মাঝেই 'চ্যারিটি 'কনসার্ট' দিতাম নানা অর্থার্থীর সাহাযার্থে। সে-বার ছিল বোধহয় ডেটিনিউদের সাহায্যার্থে—ঠিক মনে নেই। তবে এটুকু তো ভুলতে পারিনি কাজীর এই শিকল পরার গানে দেশবন্ধু বিচলিত হ'য়ে উঠেছিলেন—বিশেষ, যখন সে গাইল:

ওরে ক্রন্দন নয় বন্ধন এই শিকল ঝন্‌ঝনা;
ও যে মুক্তিপথের অগ্রদূতের চরণ-বন্দনা।
এই লাঞ্ছিতেরাই অত্যাচারকে হানছে লাঞ্ছনা,
মোদের অস্থি দিয়েই জ্বলবে দেশে আবার বজ্রানল।

দধীচির আত্মোৎসর্গের ফলেই দেবতার রাজ্যরক্ষা হয়েছিল। এই সার্থক উপমার কি তুলনা আছে? এই উপমা প্রেরণা আনে

উপর থেকে—যাকে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর Future Poetry-তে নাম দিয়েছেন শ্রুতি। ঠিক এমনি প্রেরণা নেমে এসেছিল তাঁর বিদ্রোহী মনে বিদ্রোহী-বন্দনায়ঃ

আমি সেইদিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গকৃপাণ ভীম-রণভূমে রণিবে না!
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।

কিন্তু যা বলছিলাম। দেশবন্ধুর চোখে জল চিক্‌চিক্ ক'রে উঠল, সুভাষের মুখ উঠল দীপ্ত হ'য়ে। এরপরে কাজীর মুখে বিদ্রোহী আবৃত্তি শুনেও সুভাষ মুগ্ধ হ'ত বরাবরইঃ

বল বীর, বল উন্নত মম শির!
শির নেহারি, আমার নতশির ঐ শিখর হিমাদ্রির।

বিদ্রোহী হওয়া এ-সংসারে সহজ নয়। মানুষ পারৎপক্ষে কাউকে বলতে চায় না যে সে অন্যায় করেছে।...কিন্তু কাজী ছিল স্বভাব বিদ্রোহী—Born Reble: মেলামেশায় দহরমমহরমে তার জুড়ি ছিল না বটে কিন্তু ঐ সঙ্গে অসামাজিক কথা বলতেও তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত না কেউ, এক মহানুভব দ্বিজেন্দ্রলাল ছাড়া। অত্যাচার, কপটতা, ভণ্ডামি, ন্যাকামি, গোঁড়ামি এ সবের প্রতি এঁরা দু'জনেই ছিলেন খড়্গহস্ত।

কিন্তু কাজীর বিদ্রোহ ছিল যেন আরো অগ্নিময়, ঘরোয়া তীব্র! যখন সে গাইত তার ঝাঁকড়া বাবরী চুল দুলিয়েঃ

জাতের নামে বজ্জাতি সব জাতি জালিয়াৎ খেলছ জুয়া!
ছুঁলেই তোর জাত যাবে জাত ছেলের হাতের নয়ত মোয়া!
বলতে পারিস বিশ্বপিতা ভগবানের কোন্ জাত?
কোন্ ছেলের তাঁর লাগলে ছোঁয়া অশুচি হন জগন্নাথ!

নারায়ণের জাত যদি নাই

তোদের কেন জাতের বালাই ?

(তোরা) ছেলের মুখে থুথু দিয়ে মার মুখে দিস ধূপের ধোঁয়া !'

তখন আমাদের বুকের মধ্যে কিসের বাণ ডেকে যেত বলা ভার—দুঃখ, খেদ না ভণ্ডামির প্রতি ক্রোধ, কুসংস্কারের লজ্জা ? কেবল একটা কথা বলা যায় যে, আমরা সবাই অভিভূত হ'য়ে পড়তাম তার আশ্চর্য প্রকাশভঙ্গিতে ঃ এ-ধরনের চরণ কি স্বভাব-প্রতিভাধর ছাড়া আর কারুর কলমে এমন স্বত-উৎসাহে বইতে পারে ? কাজী বিদ্রোহী কবি বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে নির্ভেজাল কবি। তাই বুঝি তার বিদ্রোহে মানুষের মনে ছোঁয়াচ লাগত এত ব্যার্থকভাবে। কত সভায় এবং চ্যারিটি কনসার্টেই না সে আমাদের গানের পরে এই ভাবের নানা গান গাইতে ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে ভাঙা গলায়, কিন্তু এমন গাইত যে, ভাঙা গলাকেও ভাঙা মনে হত না—আগুন ছুটিয়ে দিত সে। এমন প্রাণোন্মাদী গায়ক কি আর দেখব এ মনমরা যুগে ? সত্যিই আমাদের অবাক লাগত ভাবতে ভাঙা গলায়ও কাজী কোন্ মাত্বতে এমন অসম্ভবকে সম্ভব করত দিনের পর দিন—ভাবের ঢলে পাথরের বুকে আলোর ঝর্ণা বইয়ে !

একটা টুকরো স্মৃতি মনে প'ড়ে গেল ঃ সুভাষ একবার আমাকে বলেছিল ঃ ভাই, জেলে যখন ওয়ার্ডার লোহার দরজা বন্ধ করে, তখন মন কী যে আকুলি বিকুলি করে কী বলব ! তখন বার বার মনে পড়ে কাজীর ঐ গান ঃ

কারার ঐ লোহকপাট

ভেঙ্গে ফেল কর রে লোপাট

রক্তজমাট শিকলপূজার পাষাণ-বেদী !

কাজীকে জেলে যেতে হয়েছিল—এ অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর কাব্য কতখানি সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠেছে বোধহয় আমরা আজো উপলব্ধি করিনি।'

একথা পুরোপুরি সত্য হোক বা না-হোক একথা নিঃসঙ্কোচে বলা চলে যে, জেলে না গেলে কাজী কখনই লিখতে পারত না এমন প্রাণ জাগানিয়া চরণ।

তোমরা ভয় দেখিয়ে করছ শাসন, জয় দেখিয়ে নয়,
সেই ভয়ের টুঁটিই ধরব টিপে, করব তার লয়,
মোরা আপনি ম'রে মরার দেশে আনব বরাবর,
মোরা ফাঁসি প'রে আসব হাসি মৃত্যুজয়ের ফল।

সেদিনও দিল্লীতে নেতাজী স্মৃতি সভায় গিয়েছিলাম (ডিসেম্বর, ১৯৬৪) কাজীর একটি গান, যা সুভাষ অত্যন্ত ভালোবাসত ঃ

দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে,
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার।

কাজী যখনই এ গানটি গাইত মনে পড়ে সুভাষের মুখ আবেগে রাঙা হ'য়ে উঠত—বিশেষ ক'রে সে শেষ স্তবকের দুটি অমর চরণ ধরতে না ধরতে ঃ

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান,
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়াছে তারা দিবে কোন বলিদান ?

ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গাওয়ায় এ চরণটি ধরতে না ধরতে মন সম্ভ্রমে উল্লাসে ভরে ওঠে। এ-জাতীয় চরণ কলাকৌশলে আসে না, কাব্যসাধনায়ও নয়—আসে কেবল আলোকলোকের প্রেরণার অবতরণে কাজীর নানা কবিতায় পাওয়া যায় এই দিব্য প্রেরণা।

ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বাঙালী পল্টনের সৈনিক কবি নজরুল যুদ্ধ-অন্তে ফিরে এলেন গৃহে।

কতিপয় বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হয়ে ১৯২২ সালে প্রকাশ করলেন তিনি সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু'। শৌর্যের বার্তাবহ সে কাজ তরুণচিত্তে অপূর্ব আত্মদানের আহ্বান নতুন ক'রে জাগাল। বাংলার বিপ্লবীমন বিস্ময়ে 'ধূমকেতুর' প্রতিটি অক্ষরে প্রাণের কথা পাঠ করে উৎসাহিত হল।

'ধূমকেতু' বেশিদিন চলল না। এ ধারার কাগজ চলতেও পারে না বেশিদিন। কারণ, শাসকের রুদ্রদৃষ্টি এদের বাঁধতে দেয় না। নজরুলের তাতে ক্ষতি নেই আকাশের 'ধূমকেতুর' মতই বঙ্গগগনে তাঁর হঠাৎ প্রকাশ তীব্র দীপ্তি ছড়িয়ে অরুণ নয়নে চমক লাগিয়েছিল। বাংলার তরুণ তাঁর কণ্ঠের গান কেড়ে নিল। বাংলার তরুণ তাঁর দেওয়া 'ম্যাচিং রঙ্' বা লোর সঙ্গীতের তালে তালে রুটমার্চ শুরু করে দিল। বাংলা ভাষায় সামরিক পদ্ধতিতে চলার সঙ্গীতঃ অভিযাত্রীর পদ্য ছন্দেঃ

'চল্ চল্ চল্।
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল।
নিম্নে উতলা ধরণী-তল
অরুণ প্রাতের তরুণ দল—

বাংলার বিপ্লবীরা তাঁদের দুরন্ত আদর্শের উদ্গাত-রূপে তাঁকে একান্ত আপন ক'রে লাভ করতেন। নজরুলের যাত্রা শুরু হল বিপ্লব পন্থার পুরোভাগ, বিপ্লববাদের চারণ-কবির ভূমিকায়। কবির উপলব্ধির মূল তাঁরই অনুভূতির গভীরে। বলেছেন তিনিঃ

'বন্ধু গো আর বলিতে পারি না, বড় বিষজ্বালা এই বুকে—

আরও বলেছেন :

'রক্ত ঝরাতে পারি না তো একা,
তাই লিখে যাই এ রক্ত-লেখা।'

তার পরে বলেছেন :

'প্রার্থনা করো—যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস,
যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ।'

কত গভীর অনুভূতি, কত ব্যাপক ও নিবিড় বেদনা থেকে যে কবির অন্তরে বিপ্লব-সত্তার জন্ম, তার সন্ধান রয়েছে এসব উক্তির মধ্যে।

নজরুল মহাক্ষত্রিয়। নজরুল সত্যের একনিষ্ঠ পূজারী। অন্যায়ের শাসন-নাশনে তিনি পরমোৎসাহী। নজরুলের 'সত্য' মানবকে কেন্দ্র ক'রে। তাঁর কাছেও—

'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।'

তাই তিনি বলেছেন :

'গাহি সাম্যের গান—
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।'

নজরুল সত্যের খাঁটি উপাসক। তাই তিনি খাঁটি বাঙালী বা খাঁটি ভারতীয়। তিনি খাঁটি মুসলমান ব'লেই খাঁটি বিপ্লবধর্মী হতে পারলেন। তিনি মানুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ দেখলেন না। কারণ তাঁর কাছে :

'নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি,
সব দেশে সব কালে ঘরে-ঘরে তিনি মানুষের জাতি।'

তাই কবি সাম্যের গান গাইতে পারলেই। ভগবান তাঁর কাছে মিথ্যা, যদি প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ভগবানকে খুঁজে বার না করা যায়। কাজেই হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব তাঁর কাছে কায়েমীস্বার্থের প্ররোচনায় বাঁচিয়ে রাখা এক ষড়যন্ত্র-প্রসূত গ্লানি। বিপ্লবীকবির কণ্ঠে তাই শুনি :

'খোদার ঘরে কে কপাট লাগায়, কে দেয় সেখানে তালা ?
সব দ্বার এর খোলা রবে, চালা হাতুড়ি শাবল চালা !
বলেছন কবি দুঃখে ঃ

'মানুষের ঘৃণা করি
ও কারা কোরান, বেদ, বাইবেল চুম্বিছে মরি মরি !'

নজরুলের ফাঁকি নেই, ফাঁকি নেই তাঁর চিন্তায় ও কর্মে !

মহাবিপ্লবের পুরোহিত নজরুল। বিপুল তাঁর হৃদয়ের পরিসরে বিশ্বের নির্য্যাতিতদের বেদনার ছায়া পড়েছে। তাই তিনি বিপ্লবীর কম্বুকণ্ঠে সাম্যের গান গাইলেন সবার তরে। ধরার সকল পাপীর উদ্দেশ্যে জানালেন ঃ

'যত পাপীতাপী সব মোর বোন, সব মোরা ভাই।'

বিপ্লবী নজরুল বিশ্বমানবের প্রেমে অভিষিক্ত হৃদয়ে বাংলার প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে সমাজের ও রাষ্ট্রের নির্য্যাতিত নরনারীর বেদনায় গান আকুল কণ্ঠে গেয়ে গেছেন। বিদ্রোহী কবির উদ্বেল সঙ্গীতনির্ঝর সারা বঙ্গের বিপ্লবী-হৃদয়েই অটুট আত্মবিশ্বাস সঞ্চারিত করেছিল। সেই আত্মবিশ্বাস থেকেই বিপ্লবীর রক্তে জাগে প্রত্যয়লিখা ঃ

'আমরা সৃজিব নতুন জগৎ, আমরা গাহিব নতুন গান।'

১৯৩০ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত দেখি বিপ্লবী বাংলার তথা বিপ্লবী ভারতবর্ষের এক অতুগ্র গতি—যা ভয়ঙ্কর যা দুঃসাহসে সুন্দর।...চট্টগ্রাম রাইজিং রাইটার্স প্রসাদে কলিন্দ যুদ্ধ মেদিনীপুর, কুমিল্লা, ঢাকা, কলকাতা, দার্জিলিং তথা সারা বাংলায় দুর্জয়ীদের, দুঃসহ অভিযান থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রচণ্ডবিপ্লব, বিয়াল্লিশের রক্ত-ক্ষরা আন্দোলন, ছেচল্লিশের রোমাঞ্চকর নৌবিদ্রোহ প্রভৃতি বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে বিপ্লবের কবি নজরুল ইসলামের স্বপ্নরূপায়ণ। কবি যাদের উদ্দেশে বলেছিলেন ঃ

'আমি গাই তারই গান—
দৃপ্ত—দম্ভে যে যৌবন আজ ধরি' অসি খরসান,
হইল বাহির অসম্ভবের অভিমান দিকে দিকে,—
সেই বিপ্লবী তরুণদলেরই বিপুল এ কর্মপ্রবাহ।

নজরুল কবি ও দ্রষ্টা। কবির বাণী এবং দ্রষ্টার উক্তি সে-যুগে সফল হয়েছিল। রুদ্রের সাধনায় সিদ্ধ শহীদকুল—সূর্য সেন, প্রীতিলতা, বিনয় বসু, প্রদ্যোৎ, ভবানী, ভগৎ সিং, আসফাকউল্লা, উধম, সিং, যতীন দাস, মাতঙ্গিনী, কনকলতা এবং সর্বোপরি নেতাজী পরিচালিত আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অগণিত মৃত্যুজয়ী বীর এবং 'কুইট ইণ্ডিয়া'র সংগ্রামী দল এই চারণ-কবির ছন্দোবদ্ধ গানে এই ভারত-ভুমিতে এবং বহির্ভারতে মহাভাঙনের তাণ্ডব রচনা করতে পেরেছিলেন। যার আঘাতে প্রায় দুশো বছরের ইংরেজ-শাসনের বুনিয়াদ টুকরো হয়ে গেল, ভারত রাষ্ট্রীয়-স্বাধীনতা লাভ করল!

মুকুর সর্বাধিকারী

কাজী নজরুল ইস্‌লাম কবি ও বিদ্রোহী!

কৈশরের শেষ প্রান্তে তাঁকে ভাগ্যের সাথে লড়াই শুরু করতে হয়। তাঁর পিতা ফকীর আহ্‌মদ নিঃস্ব অবস্থায় মারা গিয়েছিলেন। আর নজরুল বাল্য জীবনে ইস্কুলে না গিয়ে হলেন গার্ড সাহেবের বাড়ীর চাকর, আবার কখনো আসাননোলের রুটির দোকানের বয়।

কখনো বা লেটোর দলে গান বেঁধে দিন কাটিয়েছেন!

নজরুলের বিশ্বাস ছিলো যে যুদ্ধে যেতে পারলে এবং তলোয়ার ধরতে শিখিলে মুক্তিযুদ্ধ করতে হবে। না'হলে যে পেলো ডবল প্রমোশন, আর ছিল স্কুলের উজ্জ্বলতম ছাত্র, সেই ছেলে অনায়াসে

চলে গেল বেঙ্গলী রেজিমেণ্টের সৈনিক হিসাবে। লড়াই শিখতে হবে লড়াই করার জন্য।

চুরুলিয়া গ্রামের ছেলে আবর সমুদ্র তীরে করাচীর তাঁবুর ভিতরে সংগ্রামের প্রস্তুতির জন্যও তলোয়ারে শান দিয়েছিলেন। নাম-গোত্র-হীন মুরার পুত্রের মতো অখ্যাত নজরুল ভেবেছিলেন অস্ত্রের ব্যবহার তার যুদ্ধবিদ্যা আয়ত্ত ক'রে বাঁচবেন। কারণ 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়?' কিশোর নজরুল তাই বেঙ্গলী ডাবল কোম্পানীতে যোগদান করাকে দেশ-প্রেমের প্রাথমিক কর্তব্য হিসাবে ধরে নিয়ে নিজেকে যুক্ত করলেন তার সাথে।

ইতিমধ্যে মহাযুদ্ধের মহড়া শেষ, উনপঞ্চাশ নম্বর বাঙালী পল্টন উনিশের পরেই ভাঙল। নজরুল উঠলেন খাস কলকাতায়, যেখানে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যৌবন টগ্‌বগ্‌ করে। তিনি রাজনীতির চরম ঘটনার সাথে পরিচয় হলেন, সংবাদপত্রের পাতায় তুলে ধরলেন নিজের বক্তব্য। সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ'-এর শিরোনামা, সম্পাদকীয় প্রমাণ করলো যে, কাজী নজরুল দাড়ী চাঁচার জন্য তলোয়ার ধরতে যাননি, আর কলম ধরেননি তথাকথিত ভদ্রলোকদের মনোরঞ্জনের জন্য। তবে রাজরোষের অবশ্যম্ভাবী ফল পেতে দেরি হয়নি। আর যারা টাকা দিয়ে সাহায্য করেন তারাই মুরুব্বি হলেন। তাঁদের তু'জনকে শেষ পর্যন্ত কাগজ ছাড়তে হল। অপরজন হলেন ভারতীয় রাজনীতিতে খ্যাতনামা ব্যক্তি মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ। এঁদের সাথে আর একটি স্মরণীয় নাম—এ কে ফ়জলুল্‌ হক।

'ধুমকেতু'তে সেই সময় কবি লিখেছেন, সর্ব প্রথম 'ধুমকেতু' ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। স্বরাজ-টরাজ বুঝি না, কেননা ও কথাটার মানে এক-এক মহারথী এক-এক রকম ক'রে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমানু অংশও বিদেশীর অধীনে থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসনভার—সমস্ত থাকবে ভারীয়দের হাতে। তাতে কোন বিদেশীদের মোড়লীর

অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না। আমাদের এই প্রার্থনা করার, ভিক্ষা করার কুবুদ্ধিটুকু ছাড়তে হবে…'

নিশ্চয়ই নিবারণ ঘটকের ছাত্র এবং শিষ্যের রচনা বিপ্লবী দলকে বিপুলভাবে উৎসাহিত করেছিলো। 'ধূমকেতু'র মাধ্যমে নজরুলের রচনা প্রভাবিত করেছিল বিপুলভাবে সন্ত্রাসবাদী দুইটি দলের সভ্যদের—'অনুশীলন' ও যুগান্তরের' যুগান্তরের সভ্যরা তো মনে করতেন যে ধূমকেতু, তাঁদেরই কাগজ এবং সভ্য না হলেও নজরুল কম বিপ্লবী নন। এই 'ধূমকেতু'কে সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এর কয়েকবছর পরে নজরুল আর একটি সাপ্তাহিকের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হন। এই কাগজটির নাম 'লাঙ্গল'। লাঙ্গলের পাতায় বেরুলো 'কৃষকের গান' 'কুলি মজুর, 'মানুষ – পাপ, —যার অতি খ্যাত নাম 'সাম্যবাদী। কী প্রলয়োচ্ছ্বাস এনেছিলো এ কাব্য। তার রেশ এ কয়েকটি দেশকেও বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি।

মুজফ্ফর আহম্মদ

নজরুলের বাড়ীর অঞ্চলে সাধারণ মানুষের ভিতরে গানেরও নাচের দল ছিল। সেই সকল দলের প্রভাবে সে পড়েছিল। সে নিজে এই রকম দলে যোগও দিয়েছিলেন। এইভাবে তার সঙ্গীত-চর্চার আরম্ভ। জীবনে কোন সময়ে সে এই চর্চা ছেড়ে দেয়নি। এম আবদুর রহমান সংগৃহীত তথ্য হতে জানা যায় যে শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলে পড়ার সময়ে নজরুল ইসলাম তার সঙ্গীতের জ্ঞানকে উন্নততর করার সুযোগ পেয়েছিল। এ স্কুলের সহকারী শিক্ষক শ্রীসতীশচন্দ্র কাঞ্জিলাল একজন সাহিত্যানুরাগী ও সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। নজরুলের সঙ্গীতানুরাগের পরিচয় পেয়ে তিনি তাকে

মাঝে মাঝে উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। কোনো কোনো সময়ে তিনি নিজের বাড়ীতেও নজরুলকে এইজন্য ডেকে নিয়ে যেতেন। এই মাস্টার মহাশয়ের নিকট হতে সে সঙ্গীত-বিদ্যায় অপেক্ষাকৃত উচ্চ জ্ঞানলাভের সুযোগ পেয়েছিল।

জমাদার শম্ভু রায়ের পত্র হতে আমারা জানতে পারি যে, পল্টনের ব্যারাকেও নজরুলের সাহিত্য ও সঙ্গীতের চর্চা কোনদিন থামেনি। সেখানেও ভালো ভালো বাদ্যযন্ত্র পেয়ে সে বাজানোটাও বিশেষভাবে আয়ত্ত করে নিতে পেরেছিল। সেখানেও সে সাহায্য করার লোক পেয়ে গিয়েছিল। যেমন শম্ভু রায় হুগলী শহরের হাবিলদার নিত্যানন্দ দে'র নাম করেছেন। তিনি নজরুলকে অরগ্যান বাজানো শিখিয়েছেন। সৈনিক ব্যারাকে গানের মজলিস আবার বসত নজরুলের ঘরের সামনে। তাতে সৈনিকরা 'চালাও পানসী বেলঘরিয়া', ঘি চপচপ্ কাবলীমটর, ও দে গরুর গা ধুইয়ে প্রভৃতি বুলি উচ্চারণ করে আনন্দে ফেটে পড়তেন।

পল্টন হতে ফিরে আসার পরেও নজরুল তার গানেরচর্চা অবিরাম চালিয়ে গেছে। শুধু বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত মহলে জনপ্রিয় না হয়ে সে যে জনসাধারণের ভিতরেও জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল তার গানই তার প্রধান কারণ। শ্রীযুক্তা মোহিনী সেনগুপ্তা একজন বয়স্কা ব্রাহ্ম মহিলা ছিলেন। তিনি পত্রিকায় প্রকাশিত নজরুলের দু'একটি কবিতায় সুর দিয়ে তার স্বরলিপি প্রকাশ করেছিলেন। সে সময়ে বহু পত্রিকায় শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তার স্বরলিপি ছাপা হতো। আমি নজরুলের ফৌজ হতে ফিরে আসার দুতিন মাসের ভিতরকার কথা বলছি। একদিন শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তার নিকট হতে নজরুল একখানা পত্র পেলো। তাতে তিনি তাকে অনুরোধ করেছিলেন যে সে যেন গানের কায়দা-কানুনের কাঠামোর ভিতরে গান লেখে। অর্থাৎ অস্থায়ী অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ এই চারটি গানে ভাগ ক'রে গান রচনা করার কথা তিনি তাকে বলেন। এইভাবে গান রচনা

করলে সেই গানের সুরারোপে ও স্বরলিপি তৈয়ার করায় সুবিধা হয়, এই কথাও তিনি পত্রে লিখেছিলেন। তখনও তাঁর সঙ্গে নজরুলের মুখোমুখি পরিচয় হয়নি। সে যখন সত্যকার গান রচনা শুরু করেছিল তখন সম্ভবত শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তার উপদেশ মেনে চলেছিল। সম্ভবত বলছি এই কারণে যে সঙ্গীত সম্বন্ধে আর কোনো জ্ঞান নেই।

৮।১, পানবাগান লেনের বাড়ীতে নজরুল যখন বাস করতে এলো (১৯২৮ সালের শেষাশেষি হবে, মাসটা মনে করতে পারছিনে) তখন সে সুপ্রতিষ্ঠীত। তার রচিত গান তারই দেওয়া সুরে সুর-সুর-শিল্পীরা তখন সর্বত্র গাইছেন। বিশেষ করে, তার নূতন রচিত গজল গানগুলির জনপ্রিয়তা অত্যন্ত বেশী। কিন্তু সঙ্গীতে নজরুল ইসলাম যতই প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, ব্রিটিশ্ গ্রামোফোন কোম্পানীর নিকট সে ছিল সম্পূর্ণরূপে বর্জিত। যে ব্যক্তি রাজনীতিতে (রাজনীতি মানেই তখন ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম) যোগ দিয়েছে, তার জন্য জেল খেটেছে তার সঙ্গে কি ক'রে একটা ব্রিটিশ কোম্পানী যোগস্থাপন করতে পারে?

কিন্তু দেশের আবহাওয়া বদলে গিয়েছিল। গ্রামোফোন কোম্পানীও ছিল একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। ১৯২৮ সালে এই কোম্পানীর নিকটে চারদিক হতে জিজ্ঞাসা আসতে লাগল যে, তাদের রেকর্ডে কাজী নজরুল ইসলামের গান নেই কেন? এই রকম জিজ্ঞাসা আসা খুবই স্বাভাবিক ছিল। সুর-শিল্পীরা যাঁর গান দেশের সব জায়গায় গেয়ে বেড়াচ্ছেন, তাঁর গান গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডে উঠবে না এটা কেমন কথা? কোম্পানীর টনক নড়ল। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে কাজী নজরুল ইসলামকে আরও এড়িয়ে চলার মানেই হবে ব্যবসায়ের দিক হতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। কোম্পানীর কর্মকর্তারা এই অবস্থায় যখন নজরুলের ঠিকানা যোগাড় করতে যাচ্ছিলেন, তখনই তাঁরা খবর পেলেন যে, তাঁদের রেকর্ডের দু'টি গান লেখা। সুবিখ্যাত গায়ক শ্রীহরেন্দ্র ঘোষ নজরুলের দু'টি কবিতার অংশবিশেষ সুর দিয়ে

গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডে গেয়েছিলেন। তখন তিনি কোম্পানীকে জানতে দেননি যে, এই ছুটি গানের রচয়িতা কে জানতে দিলে কোম্পানীর কর্তারা গান ছুটি তাঁকে গাইতে দিতেন না। এখন কিন্তু খবরটি জানতে পেরে কোম্পানীর কর্তারা খুশীই হলেন। সঙ্গে সঙ্গে রচয়িতার পাওনা রয়্যালটির হিসাব ক'রে দেখা গেল যে, নজরুলের কয়েক শ' টাকা (কত টাকা আমার মনে নেই) পাওনা হয়েছে। এই টাকাটা তাঁরা লোক মারফতে সোজাসুজি নজরুলের নিকটে তার পানবাগান লেনের বাড়ীর ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলেন। কোম্পানীর দ্বারা সেও আমন্ত্রিত হলো যে, তার গান যেন গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডে গাইতে দেওয়া হয়। এইভাবেই গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গে স্থাপিত হয়েছিল নজরুলের প্রথম সম্পর্ক। আর সেই সঙ্গে খুলে গেল তার চোখের সামনে একটি নূতন দিগন্ত। নজরুল বরাবর গান গেয়েছে। গান সে লিখেও যাচ্ছিল। যতটা মনে করতে পারছি—তার গানের পুস্তক 'বুলবুল' তখন ছাপা হয়েছিল। বই হতে কম হোক, বেশী হোক টাকা সে পাচ্ছিল, কিন্তু গান হতে সে টাকা পেল এই প্রথম। তার সামনে একটা নূতন দিগন্ত খুলে গেল বইকি!

ক্রমশ একান্তভাবে সুরের রাজ্যে নজরুল তো প্রবেশ করছিলই গ্রামোফোন কোম্পানীর নিমন্ত্রণে তার প্রেরণা আরও বেড়ে গেল। তখনই তার মনে এসেছিল যে, ওস্তাদী গানের বিদ্যাটা সে আরও ঝালিয়ে নেবে। এই সময়েই ওস্তাদ জমিরুদ্দীন খানকে তার বাড়ীতে দেখা গেল। একদিন তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়ও নজরুল করিয়ে দিয়েছিল। তাঁর নামে ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ ১লা আশ্বিন (খ্রীঃ ১৬ই কিংবা ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩২) তারিখে গানের পুস্তক 'বন-গীতি' উৎসর্গ করতে গিয়ে নজরুল লিখেছে ঃ

> ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত কলাবিদ আমার গানের
> ওস্তাদ জমিরুদ্দীন খান সাহেবের দস্ত্ মোবারকে।'

এর সঙ্গে সে যে কবিতাটি লিখেছে তার শেষ দু'ছত্রও আমি এখানে তুলে দিলাম :

'সুর শা' জাদীর প্রেমিক পাগল হে গুণী তুমি
মোর 'বন-গীত' নজরানা দিয়া দোস্ত্ চুমি।'

'মোবারক' আরবী ভাষার শব্দ। তার মানে শুভ। 'দস্ত্' পারসী ভাষার কথা, মানে হাত। নজরুল যখন ১৯২৯ সালের শুরুতে ওস্তাদ জমিরুদ্দীন খানের নিকট হইতে গানের শিক্ষা নিচ্ছিল তখন তিনি গ্রামোফোন কোম্পানীতে সঙ্গীতের 'ট্রেনার'ও ছিলেন।

১৯২৮ সালের ২০শে মার্চ তারিখে ধরা পড়ে আমি যখন আবার জেলে গেলাম তখন দেখে গেলাম যে, কাজী নজরুল ইস্‌লাম সম্পূর্ণরূপে সুরের রাজ্যে প্রবেশ করেছে।

নজরুল ইস্‌লাম এক সঙ্গে গায়ক, সঙ্গীতের রচয়িতা ও সুর সংযোজনকারী। এই তিন গুণের সমন্বয়ে উনিশ শ' ত্রিশের দশকে আমাদের দেশকে সে অপূর্ব অবদান দিয়ে গেছে। সুরের সৃষ্টিতে সে অভূতপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। সঙ্গীত রচনায় তার তুলনা নেই। নারায়ণ চৌধুরী লিখেছেন যে, নজরুল ইস্‌লাম রচিত সঙ্গীতের সংখ্যা তিনহাজার। ১৯৬৪ সালে একজন বন্ধু শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর নিকট হতে শুনে এসে আমায় বলেছিলেন যে নজরুল রচিত গানের সংখ্যা তিন হাজার নয়, চার হাজার। আমার যতটা মনে পড়ে নজরুল নিজেও একদিন তার গানের সংখ্যা আমায় তিন হাজার বলেছিল। ১৯৩৬ সালের শেষাশেষিতে কিংবা ১৯৩৭ সালের শুরুতে নজরুল আর আমি তার বাড়ীতে একদিন একসঙ্গে খেতে বসেছিলাম। বহু বৎসর কলিকাতা হতে আমায় অনুপস্থিত থাকতে হয়েছিল বলে আমি অনেক কিছুই জানতাম না। সেজন্য খেতে বসে আমি নজরুলকে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'তোমার লেখা গানের সংখ্যা কত, একহাজার দেড় হাজার হবে?' নজরুল উত্তরে বলেছিল, 'প্রায় তিন হাজার।' শুনে আশ্চর্য হয়ে আমি তাকে

আবার জিজ্ঞেসা করেছিলাম, 'বলছ কি তুমি ? রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বেশী ?' সে জবাব দিয়েছিল, হ্যাঁ'। আমি কোথাও রবীন্দ্রনাথের লেখায় পড়েছিলাম যে, তাঁর লেখা গানের সংখ্যা আড়াই হাজার। যদি আমি ভুলে না গিয়ে থাকি তবে এই সময়ে নজরুল ইস্‌লাম গ্রামোফোন কোম্পানীর গানের ; ট্রেনার ও হেড 'কম্পোজার' ছিল। ওস্তাদ জমিরউদ্দীন খানের মৃত্যু হওয়ার পরে সে-ই এই কাজে নিযুক্ত হয়েছিল।

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবার সময় তেমন তেমন বড়লোককেও সমীহ করে যেতে দেখেছি,—অতি বাক্‌পটুকেও ঢোঁক গিলে কথা বলতে শুনেছি—কিন্তু নজরুলের প্রথম ঠাকুর বাড়ীতে আবির্ভাব সে যেন ঝড়ের মত। অনেকে বলত, 'তোর এসব দাপাদাপি চলবে না জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে, সাহসই হবে না তোর এমনভাবে কথা কইতে।'

নজরুল প্রমাণ করে দিলেন যে, তিনি তা পারেন। তাই একদিন সকালবেলা—'দে গরুর গা ধুইয়ে' এই রব তুলতে তুলতে তিনি কবির ঘরে গিয়ে উঠলেন—কিন্তু তাঁকে জানতেন বলে কবি বিন্দুমাত্রও অসন্তুষ্ট হলেন না।···

নজরুল ধর্মের চেয়ে মানুষকে বড় করে দেখছেন সব সময়, তাই ধর্ম-নির্বিশেষে নজরুলকে ভালবাসতে কারো বাধেনি।

কতদিন আমাদের বাড়ীতে গানের মজলিস বসেছে, খাওয়া-দাওয়া করেছি আমরা একসঙ্গে, গোঁড়া বামুনের ঘরে বিধবা মা, নজরুলকে নিজের হাতে খেতে দিয়েছেন—নিজের হাতে বাসন মেজে

ঘরে তুলেছেন, বলেছেন, 'ও ত আমারই ছেলে—ছেলে বড় না আচার বড় ?'

এই যে নজরুল আপনাকে সকলের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছেন তাঁর প্রাণের প্রাবল্যে, হৃদয়ের মাধুর্যে—এই তো মানুষের সবচেয়ে বড় আদর্শের কথা।

নলিনীকান্ত সরকার

স্বার্থবিমুখ নজরুল কোনদিনই পরার্থপরতায় পরাঙ্মুখছিলেন না। মাত্র একটি ঘটনার কথা বলি।

দক্ষিণ কলকাতায় একটি দুঃস্থ কন্যার বিবাহ। কোনরূপে দায় নির্বাহ করার আয়োজন চলছে।

কন্যাপক্ষ নজরুলের পরিচিত।

একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে নজরুল তাঁর গাড়ী নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত। এসে বললেন, 'তোমার এখন কোন কাজ আছে ? একটু এসো না আমার সঙ্গে।'

'কোথায় যাচ্ছো ?'

নজরুল প্রথমে কিছুই ভাঙলেন না।

গাড়ী সটান চৌরঙ্গী অভিমুখে চলে থামলো, 'বেঙ্গল-স্টোরস্-এর সামনে।' 'বেঙ্গল-স্টোরস্,-এ নেমে তখন তিনি সমস্ত কথা প্রকাশ করলেন আমার কাছে।

হিন্দু-বিবাহের লৌকিক ব্যাপারের সঙ্গে নজরুলের বিশেষ পরিচয় ছিলো না, এইজন্য আমাকে সঙ্গে নিয়ে আসা।

বেঙ্গল-স্টোরস্ থেকে নজরুল ফুলশয্যার তত্ত্বের বহু জিনিস কিনলেন। গাড়ী বোঝাই সেই সকল সামগ্রী কন্যার বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি।

গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায়

নজরুলের আসল পরিচয় আমাদের অগোচরেই রয়ে গিয়েছে, তাঁর ব্যক্তিসত্তার মর্ম-কেন্দ্রটি আমাদের কাছে আজও উদ্‌ঘাটিত হয়নি। যিনি আজ স্তব্ধ' মূলক হয়ে আমাদের মধ্যে বছরের পর বছর কাটাচ্ছেন তাঁর মহামৌনের অতলে ডুব দিলে শুনতে পাওয়া যাবে শুধু মাতৃনামের ঝঙ্কার। কাজী নজরুল ইসলাম স্বভাবে ও স্বরূপে মাতৃসাধক বা পরম শক্তি। প্রথম জীবনে দেশমাতৃকারূপে এই জননীই তাঁর ধ্যান আরাধনার বিষয় ছিলেন এবং শেষের দিকে বিশ্বমাতকা বা জগজ্জননীরূপে তিনিই তাঁর আরাধ্যা হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর অন্তর্জীবনের এ পরিণতির খবর হয়তো অনেকে রাখেন না, গীতি সুরকার বা কবি গায়ক নজরুলের অন্তরালে সাধক নজরুলের অস্তিত্বের কথা অনেকেই জানেন না।

তিনি শক্তিতত্ত্ব বা মাতৃস্বরূপের নব ভাষ্যকার। চমকে যেতে হয় তাঁর হিন্দুশাস্ত্রে গভীর অনুপ্রবেশ দেখে।...

এই নিখিলের আরাধ্য মহাশক্তিকে তাঁর নানা বিভাগ বন্দনা করেছেন কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'দেবীস্তুতি'তে। মূলে যিনি আদ্যাশক্তি পরমা কুমারী তাঁর মুখ্য তিনটি বিভূতি বা বিভাবঃ মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী। মহাকালীরূপে তাঁর প্রথম আবির্ভাব মধুকৈটনাশের জন্য বিষ্ণুকে উদ্বোধিত করতে। কাজী নজরুল মধু ও কৈটভকে চিনেছেন অধৈর্য ও অবিশ্বাস রূপে। তাঁর এ ব্যাখ্যা যেমন অভিনব তেমনি আকর্ষণীয়। তেমনি মহিষাসুরকে তিনি দেখেছেন ক্রোধের প্রতীকরূপে, যার বিনাশ সাধন করেন মহালক্ষ্মী এবং জগতে এনে দেন শান্তিসুষমা, সুখসমৃদ্ধি। আর শেষ কাম ও লোভরূপী শুম্ভ-নিশুম্ভকে বধ করেন সরস্বতী তাঁর জ্ঞানের প্রোজ্জ্বল খড়্গ দিয়ে। তখন—

'মা যে আমার কেবল জ্যোতি'

এবং

সেই পরম শুভ্র জ্যোতির্ধারায়
নিখিল বিশ্ব ডুবে যায়।'

এই পরম অনুভবে কবি আত্মহারা। আমাদের শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মায়ের এই তিন মূল বিভাগের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হয়েছে, মধুকৈটভাদি দৈত্য বা অসুরের নানা আধ্যাতিক ব্যাখ্যাও প্রাচীন কালে প্রচলিত ছিলো এবং আধুনিক যুগেও 'সাধনা সমর' প্রভৃতি গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়।

বাংলা দেশের এই মহা দুর্দিনে কবির এই অভিনব শাক্তপদাবলী এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে এনেছে।

বিনয়কুমার সরকার

নজরুলের লেখা গান শুনি প্রথম ১৯২৫ সনের ডিসেম্বর মাসে। ব্যারিস্টার কুমুদনাথ চৌধুরীর বাড়ীতে (ব্রাইট স্ট্রীট, বালিগঞ্জ) তাঁরা আমাদেরকে অতিথি ক'রে রেখেছিলেন। প্রায় বার বছর পর বিদেশ হ'তে কলকাতায় ফিরে এলাম ; প্রথম বিদেশ-পর্যটদের কথা বলছি ঃ মেয়েরা গান করতো। কোরাস্ শুনেছিলাম। নিম্নরূপ ঃ

'চল চল্ চল্।
উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল।
নিম্নে উথলা ধরণীতল
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চলরে চলরে চল্।'

জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম, নজরুলের লেখা ঃ শুনবামাত্র মনে পড়লো 'বিদ্রোহী'র—

'বল বীর
বল উন্নত মম শির।
শির নেহারি আমারি নত শির ওই শিখর হিমাদ্রির॥

এই কবিতার চরম তারিফ ক'রেছিলাম প্রবাসে 'ফিউচারিজাম্ তব ইয়ং এশিয়া (বার্লিন, ১৯২২)।

নজরুল আধুনিক বাংলা কাব্যের যুগ-প্রবর্তক।...নজরুলের গান শুনেছি এখানে-সেখানে তাঁর চেলাদের মুখে। নজরুলের সঙ্গে প্রথম দেখা হল বোধ হয় মুসলিম সাহিত্য সম্মেলনে (১৯৩২)—দ্বিতীয় বিদেশ-পর্যটনের পর। সেই সম্মেলনেই সেকালেই প্রবীণ কবি কায়কোবাদ ও একালের প্রবন্ধ-সাহিত্যিক ওদুদের (কাজী আবদুল ওদুদ) সঙ্গে আলাপ। নজরুলের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছিল অন্যান্য সভা-সমিতিতেও। তাঁর নিজ গলায় গাওয়া গান শুনেছি ভূতপুর্ব মেয়ের জাকারিয়ার বাড়ীতে (সেপ্টেম্বর, ১৯৪২)। নৈশ ভোজনে উপস্থিত ছিলেন আবদুল ওদুদ, হুমায়ুন কবির, কৃষক'-সম্পাদক মনসুর' মানব-দরদী যুবা-কবি হাতেম আলি নওরোজি। দরজার ফাঁক দিয়ে অন্দর হ'তে মেয়েদের ফরমায়েস এল 'অগ্নিবীণা' পড়বার। নজরুলের পাঠণ শুনা গেল সেই বৈঠকে।...

কিন্তু সেদিনকার আবহাওয়ায়ও নজরুল আমার কাছে গানের কবি বা একমাত্র গায়ক রূপেই র'য়ে গেলেন। শুনা গেল ফজলুল হকের, 'নবযুগ' দৈনিকে তাঁকে সম্পাদক করা হবে। 'নবযুগ' যখন বেরুলো, তাতে 'ঈদের চাঁদ' কবিতা দেখলাম নজরুলের। বেশ জেরোল ও ঝাঁঝাল...

বুঝলাম নজরুল শুধু গানের কবি মাত্র নন' গায়ক-কবিও বটে। তাঁর গানের সুরগুলো লাগে ভাল। রৈবিক সুরও আমার পছন্দসই। নজরুলের সুরও পছন্দ-সই। বাঙালীকে গজল শুনিয়ে নজরুল নামজাদা। কিন্তু গজলই তাঁর একমাত্র সুর নয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সুর হয়েছে রৈবিক সুরের ধারা।

নজরুলি সুরের ধারা সুর হ'লো তার প্রায় বছর পঁচিশেক পর। ধারা দুইটা বেশ-কিছু স্বতন্ত্র। দুই ধারাই বাঙালী জাতকে মাত করেছে। রৈবিক সুর আর নজরুলি সুর অনেকদিন পর্যন্ত বাংলা দেশকে মাত করে রাখবে। এই দুই সুরের ধারা অনেকটা আলাদা আলাদা ভাবে বাংলার নর-নারীকে তাতাতে-তাতাতে চলবে। হয়তো কোথাও-কোথাও রৈবিক সুরের সঙ্গে নজরুলি সুরের মত মেলামেশাও সাধিত হ'তে থাকবে। সুর-শিল্পী নজরুল বাঙালী-সমাজে অমর। (গম্ভীরা)' জারি, রাবীন্দ্রিক ইত্যাদি সুরের মতন নজরুলি সুরও বঙ্গীয় সঙ্গীত-সংস্কৃতির অন্যতম সম্পদ।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

পুত্র বুলবুলের মৃত্যুতে উন্মাদপ্রায় হয়ে গিয়েছে নজরুল। সে কী, মৃত্যু কেন। মৃত্যু তো অকাল মৃত্যু কেন? চারিদিকে এতো উৎসব উজ্জ্বল জীবন সমারোহ, তার মাঝে কেন, এই অকাল-নির্বাপণ! এই শীতল সমাপ্তি? এই প্রাণোচ্ছল সদানন্দ শিশু কি মরবে বলে এসেছিল? কিন্তু তার চোখে-মুখে, দেহে-মনে, তাপ তো কোন সঙ্কেত, কোন অভাস ছিলো না। প্রদীপটি স্থির শিখায় জ্বলতে না-জ্বলতে কে তাতে নিশ্বাস ফেললো? কে সমস্ত কিছু নিবিয়ে দিলে এক ফুঁয়ে। কে সে? কোথায় সে? তার দেখা পেল একবার জিজ্ঞেস করতাম, কোন্ পথে গেলে তার দেখা পাওয়া যায়? আমাকে সে পথের সন্ধান কে দেবে?

'সাহসা একদিন তাকে দেখলাম' 'পথহারার পথ' নামে বইটির ভূমিকায় লিখেছে নজরুল: নিমন্ত্রিতা গ্রামে বিবাহ সভায় সকলে

বর দেখছ' আমার ক্ষুধাতুর আঁখি দেখছে আমার প্রলয়-সুন্দর সারথিকে। সেই বিবাহ সভায় আমার বধূরূপিণী আত্মা তার চির জীবনের সাথীকে বরণ করে নিলো। অন্তঃপুরে মুহুর্মুহুঃ শঙ্খধ্বনি হুলুধ্বনি হচ্ছে। শ্বেতচন্দনের শুচি সুরভি ভেসে আসছে, নহবতে সানাই বাজছে—এমন শুভক্ষণে আনন্দবাসরে আমার সে ধ্যানের দেবতাকে পেলাম, তিনি এই গ্রন্থ-গীতার উদগাতা শ্রীবরদাচরণ মজুমদার মহাশয়, আজ তিনি বহু সাধকের পথপ্রদর্শক। সাধন-পথের প্রতিটি পথিক আজ তাঁকে চেনে। কিন্তু যেদিন আমি তাঁকে দেখি, তখনও তিনি বিশিষ্ট কয়েকজন ছাড়া অনেকের কাছেই ছিলেন অপ্রকাশ।

সেদিন থেকে আমার বহির্মুখী চিত্র অন্তরে কার যেন অভাব বোধ করতে লাগলো। তখন ভারতে রাজনীতির ভীষণ ঝড় উঠেছে—অসহযোগ আন্দোলনকে বাংলার প্রলয়ঙ্কর রুদ্রের চেলারা ভ্রূকুটিভঙ্গে ভয় দেখাচ্ছে, আমি ধূমকেতুরূপে সে রুদ্র ভৈরবদের মশাল জ্বেলে চলেছি।

কিছুদিন পরে যখন আমি আমার পথ খুঁজছি তখন আমার প্রিয়তম পুত্রটি সেই পথের ইঙ্গিত দেখিয়ে আমার হাত পিছলে মৃত্যুর সাগরে হারিয়ে গেল। মৃত্যু এই প্রথম আমার কাছে ধর্মরাজরূপে দেখা দিলেন। সেই মৃত্যুর পাশ্চাতে আমার অন্তরাত্মা নিশিদিন ফিরতে লাগলো। ধর্মরাজ আমার হাত ধরে তাঁরই কাছে নিয়ে গেলেন, যাঁকে নিমতিতা গ্রামে বিবাহ সভায় দেখেছিলাম। ধ্যানে বসে আবিষ্টের মতো তাঁকে বাইশবার প্রদক্ষিণ করলাম। ধর্মরাজ আমার পুত্রকে—বুলবুলকে—শেষবার দেখিয়ে হেসে চলে গেলেন।

"পথহারার পথ' শ্রীবরদাচরণ মজুমদারের লেখা। পথহারার পথ অর্থ যোগসাধনার পথ। কালক্রমে নজরুল আবার সেই পথের

পর্যটক। নজরুল তাই শুধু যোদ্ধা নয়, সে আবার যোগী। তার যোগ আর যুদ্ধ একসঙ্গে। সে বুদ্ধযোগী, যোগীযোদ্ধা।

শ্রীঅরবিন্দ তাই। নেতাজী সুভাষ তাই। নজরুলও তাঁদের অনুগামী। অরবিন্দের মতো নজরুল আবার কবি।

লিখেছে নজরুল; 'আমি আমার আন্দ-রস-ঘন স্বরূপকে দেখেছি। কি, দেখেছি, কি, পেয়েছি আজও তা বলবার আদেশ পায়নি। হয়তো আজ তা গুছিয়ে বলতেও পারবো না, তবু কেবলই মনে হচ্ছে, আমি ধন্য হলাম, আমি বেঁচে গেলাম। আমি অসত্য হতে সত্যে এলাম, তিমির হতে জোতিতে এলাম, মৃত্যু হতে অমৃতে এলাম।

ব্ল্যাক আউটের রাতে নিবিড় অন্ধকারে একা-একা হেঁটে গিয়ে দক্ষিণেশ্বরে ধ্যানে বসছে নজরুল' আবার বিরাজসুন্দরী অন্তিম শয্যায় পাশে বসে ভক্ত হরিদাসের মত নাম কীর্তন করছে। আর তার মুখে নাম শুনে গৌরপিতচিত্ত বিরজা সুন্দরী বলেছেন, অদ্যাপিও সংকীর্তন করে গোরা যায়। কোন কোন ভাগ্যবান দেখতে পায়।
বিরজাসুন্দরী সেই ভাগ্যবতী।

সুশীলকুমার গুপ্ত

...যৌবনের মূর্ত প্রতীক নজরুলের আবির্ভাব ধূমকেতুর মতো। তিনি 'অগ্নিবীণা'য় 'প্রলোয়াল্লাসে' শুনিয়েছেন :

'ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর ?—প্রলয় নূতন সৃজন-বেদন !
আসছে নবীন—হারা অ-সুন্দরে করতে ছেদন !
তাই সে এমন কেশে বেশে
প্রলয় বয়েও আসছে হেসে—
মধুর হেসে !

ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চির সুন্দর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !!

নজরুলের যৌবনের মধ্যে এক প্রচণ্ড অহমিকা, প্রবল প্রাণময়তা ও দুর্মর পৌরুষ ছিলো যার জন্য তিনি ঘোষণা করতে পেরেছিলেন ঃ

'বল বীর—
বল উন্নত মম শির
শির নেহারি আমারি, নত-শির ওই শিখর হিমাদ্রির !
বল বীর—
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'
চন্দ্র সূর্য গ্রহতারা ছাড়ি'
ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া,
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব বিধাত্রীর !'

নজরুল যৌবনের কবি বলে তিনি যৌবনের সর্ববাধাজয়ী শক্তি ও অপ্রতিহত গতিতে আস্থাশীল। তাঁর উদ্দীপ্ত কণ্ঠের প্রশ্ন, 'এই যৌবন-জল-তরঙ্গ রোধিবি কি দিয়া বালির বাঁধ ?' নজরুল জানেন যে, গর্বোদ্ধত যৌবনই বৃদ্ধত্ব ও স্থবিরত্বের শাসন ও ষড়যন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে নূতন জীবন ও জগৎ সৃষ্টি করতে সক্ষম। তিনি যৌবনের পূজারী বলে যৌবনের প্রতীক পৃথিবীর শ্রমশক্তির বিজয়-সঙ্গীতে মুখর হয়ে উঠেছেন। এই শ্রমশক্তিই জরা মৃত্যু বিভীষিকাময় পৃথিবীকে সুন্দর ও মনোহর করে তোলে। শ্রমজীবীদের বিষয়ে তাঁর ঘোষণা ঃ

'গাহি তাদের গান—
ধরণীর হাতে দিল যারা আনি ফসলের ফরমান।
শ্রম-কিণাঙ্ক-কঠিন যাদের নির্দয় মুঠি তলে
ত্রস্ত ধরণী নজ্‌রানা দেয় ডালি ভ'রে ফুলে ফলে।'

নজরুলের আন্তরিক কামনা, যৌবন জয়ী হোক, 'জড়তা ও জরা যাক, প্রতি নিঃশ্বাসে 'পাব' নিঃশ্বাস বেঁচে থাকা!' তাঁর নৌজোয়ান 'নিত্য অভেদ উদার প্রাণ'। তিনি বলে, 'মৃত্যুতে তারা করে না ভয় নৌজোয়ান!' তাহারা বুদ্ধি বদ্ধ নয় নৌজোয়ান, নৌজোয়ান! তিনি পৃথিবীতে যৌবনসম্পন্নদের মৃত্যুহীন লীলা-বৈচিত্র্য প্রত্যক্ষ করে দৃপ্ত-কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন ঃ

'ইহাদের রণ-নৃত্যের তালে পদতলে হয় গুঁড়া
ভোগ-বিলাসীর তখ্‌ত ও তাজ, লীলা-প্রাসাদের চূড়া?
ইহারাই প্রেমলোক হতে আসে প্রহার-অস্ত্র হাতে,
ইহারাই আনে বিজয়োল্লাস ধরণীর আঙিনাতে!
এরা দুর্জয়, এরা নির্ভয় এরা আল্লার সেনা,
এরাই ফোটায় নিরাশার বনে আশার হাস্‌নাহেনা।'

এইজন্য যৌবনের কবি নজরুল ভারতের যুবশক্তির লাঞ্ছনা, অপমান ও দীনতা দেখে হতাশা ও গ্লানিতে জর্জরিত হয়েছেন। 'যৌবনের টিকা-পরা তরুণের দল' কাজ জরাগ্রস্ত বুদ্ধিজীবী ও ধূর্ত রাজনীতিবিদদের প্রলোভনের শিকার হয়ে অধঃপতনের চরম সীমানায় পোঁচেছে। তাই তাঁর সুতীব্র বেদনাজনিত খেদোক্তি, 'যৌবনের এ লাঞ্ছনা দেখিবার আগে কেন মৃত্যু হইল না?' কিন্তু তিনি তরুণদের বিষয়ে আস্থা হারাননি, কেননা, তিনি তাদের মধ্যে ভয়হীন, দ্বিধাহীন ও মৃত্যুহীন ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করেছেন। অরুণদের অন্তর্নিহিত শক্তির উদ্বোধনে তাই তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'চাহ আঁখি খুলে আপনার মাঝে দেখ আপন স্বরূপ! অতীত-দাসত্ব ভোলো। বৃদ্ধ সাবধানী হতে পারে না কভু তোমাদের নেতা।' তিনি কঠোর দুঃখে তরুণ তাপসদলকে আহ্বান করেছেন এক শ্রমহান্ বীর্যবান ও প্রাণবন্ত জগৎ সৃষ্টি করবার জন্য। তরুণদের একাত্ম হয়ে তিনি বলে উঠেছেন ঃ

'কোথায় মানিক ভাইরা আমার সাজ্ রে, সাজ্।
আজ বিলম্ব সাজে না চালাও কুচ্ কাওয়াজ!
আমরা নবীন তেজ প্রদীপ্ত বীর তরুণ—
বিপদ বাধার কণ্ঠে ছিঁড়িয়া শুষিব খুন।
আমরা ফলাব-ফুল-ফসল।
অগ্রপথিক রে যুবাদল,
জোর কদম চল্‌রে চল॥'

নজরুলের তরুণেরা দেশমাতার পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরবে। বর্তমানের দারুণ দৈন্যতার মধ্যেও তিনি তাদের শুনিয়েছেন বাণী। তাঁর ভাষায় 'ভয় কি আয়, ঐ মা অভয়-হাত দেখায় রামধনুর লাল শাঁখায়!' তারুণ্যের উদ্দেশ্যে নজরুলের কণ্ঠ ধ্বনিত হয়েছে ঃ

'নাকের বদলে নরুন চাওয়া এ নরুণের নাহি চাই—
আজাদ মুক্ত স্বাধীন চিত্ত যুবাদের গান গাই।
হোক সে পথের ভিখারী, সুবিধা-শিকারী নহে যে যুবা
তারি জয়গাথা গেয়ে যায় চিরদিন মোর দিলরুবা।"

যৌবনের কবি বলে 'বিদ্রোহী,' বাঁধনহারা, 'অগ্নিবীণা'—বাদক। তিনি একদিকে 'দোলন-চাঁপা'র গন্ধে বিভোর, অন্যদিকে 'ফণি মনসা'র প্রতি আগ্রহশীল! তিনি 'ভাঙার গান, শোনান, 'প্রলয়-শিক্ষা' জ্বালান। তিনি কঠোর ও কোমল, সুন্দর ও ভীষণ, সামঞ্জস্য ও অসামঞ্জস্য, সাম্য ও বৈষম্যে বিচিত্র, দুর্দমনীয় ও গতিশীল যৌবনের প্রাবল্য ও উদ্দীপনায় কখনো তিনি দৃপ্ত, মহৎ ও অম্লান, আবার কখনো স্খলন, পতন ত্রুটিতে অসম,ভারসাম্যহীন ও দীপ্তিহীন। বলা বাহুল্য, এ সবই যৌবনের ধর্ম এবং তাই জীবনের সমগ্র সাধনায় বিধৃত আর নজরুল এই যৌবনের কবি বলে তাঁর আবেদন এতো দুর্বার, প্রাণবন্ত এবং অনেক ত্রুটি ও তর্কসাপেক্ষ গুণ সত্ত্বেও অব্যর্থ।

মুহম্মদ হাবীবুল্লাহ বাহার

…কাজী সাহেব চট্টোগ্রামে আমাদের বাড়ী গিয়েছে কয়েকবার। যে ক'দিন তিনি ছিলেন চট্টগ্রামে, আমাদের বাড়ীখানি যেন ভেঙ্গে পড়বে। রাত্রি দশটায় থারমোফ্লাস্কে ভরে চা, বাটা ভরা পান৷ কালিভরা ফাউন্টেন পেন আর মোটা মোটা খাতা দিয়ে তাঁর শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিতাম।

সকালে উঠে দেখতাম, খাতা ভর্তি কবিতা। এক-এক করে 'সিন্ধু', তিনতরঙ্গ', গোপন প্রিয়া, 'অনামিকা', বর্ণফুলি', 'মিলন মোহনায়', 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি', 'নবীনচন্দ্র', 'বাংলার আজিজ', 'শিশু যাতুকর,' 'সাত-ভাই চম্পা'—আরোও কতো কবিতা লিখেছেন আমাদের বাড়ীতে বসে। চট্টগ্রামের নদী, সমুদ্র, পাহাড় আমাদের বাড়ীর সুপারী গাছগুলো আজ অমর হয়ে আছে তাঁর সাহিত্য।

সারারাত কবি চা আর পান খেতেন—আর খাতা ভর্তি করতেন কবিতা দিয়ে। তুপুরে কখনো কিছু পড়তেন, কখনো করতেন পামিষ্ট্রির চর্চা, কখনো বা মশগুল হতেন দাবা খেলায়। বিকেলে দল বেঁধে যেতাম নদীতে, সমুদ্রে। সাম্পানওয়ালা এসে জুটতো, সুর করে চলতো সাম্পানের গান। সবাই মিলে গান ধরতাম, আমার সাম্পান যাত্রী না লয়, ভাংগা আমার তরী,'…'ওগো, গহীন জলের নদী,…এক এক সময় চট্টগ্রামী সাম্পানওয়ালারা গাইতো—'বঁধুর আমার চাটি গাঁ বাড়ি—বঁধুর আমার নদীর কুলে ঘর।'

এক-একবার বেড়াতে যেতাম ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ে। কখনো পারতেন তিনি আরবী পোশাক, কখনো বা ব্রিচেস। কাজী সাহেবকে নিয়ে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের পাহাড়, জঙ্গল, হ্রদ, জলপ্রপাত খালবিল, নদী-চরে বেড়িয়েছি সঙ্গে ছেলের দল। এতবড়ো বিদ্রোহী বীর, কিন্তু জোঁককে তিনি বড়ো ভয় করতেন। একবার

সীতাকুণ্ডের পাহাড়ে উঠে জোঁকের ভয়ে আর তিনি নামাতে চান না। কয়েকজন মিলে কাঁধে করে নামাতে হয়েছে শেষ পর্যন্ত।

আমার জীবনের মজার ঘটনা কাজী সাহেবকে নিয়ে। আমার আত্মীয়েরা সকলেই প্রায় সরকারী চাকুরে। সবাই ধরে বসলেন—আমাকে আই, সি, এস পরীক্ষা দিতে হবে। পরীক্ষায় পাশ হলাম, ডাক্তারী পরীক্ষা হয়ে গেলো। শুধু Secretary of State-এর মঞ্জুরী বাকী। কাজী সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করা হলো, নিযুক্তি-পত্র এলে কলকাতা কংগ্রেসের সময় মঞ্চের উপর উঠে পদত্যাগের কথা ঘোষণা হবে। কাজীদার ভক্ত-শিষ্য পুলিশের চাকরি করবে, তিনি সইতে পারতেন না। পদত্যাগ আমাকে আর করতে হয়নি কথাটি আগেই বেরিয়ে পড়েছিলো। টেগার্ট সাহেবের দৌলতে ইংরেজের চাকরির খাতা থেকে আমার নাম কেটে যায় চিরদিনের জন্য। আমি তখন কাজী সাহেবকে নিয়ে সভা করে বেড়াচ্ছি। কাজী সাহেব বক্তৃতা করেছেন, গান্ধীজীর দল কাটছে চরকা—আমরা কাটবো মাথা।' কাজী সাহেবের মনে কারুর প্রতি
চরকা—আমরা কাটবো মাথা।' কাজী সাহেবের মনে কারুর প্রতি
বিদ্বেষ দেখিনি কোনদিন। তিনি ছিলেন সকল ক্ষুদ্রতার উর্ধ্বে। মাঝে মাঝে তিনি বলতেন ঃ

'দে গরুর গা ধুইয়ে।'

গরুর গায়ে পানি ঢেলে দিলে সে যেমন করে আনন্দে লাফাতে থাকে, তার মধ্যে তখন থাকে না বিদ্বেষ-বিষ, সে-রকম অনাবিল আনন্দের ধ্বনি এই ঃ

'দে গরুর গা ধুইয়ে।'

নজরুলকে 'জাতীয় কবি' বললেই সবটুকু বলা হলো না। আমাদের জীবনে নজরুল ইসলাম কতখানি জায়গা জুড়ে আছেন, পরিমাপ করা সহজ নয়। এক কথায় বলতে গেলে কাজীদাকে বাদ দিয়ে আমরা নিজের কথা ভাবতেই পারিনে। আমাদের রাজনীতি

আমাদের সাহিত্য, আমাদের মানস ও মনন—এক কথায় আমাদের জীবনের অনেকখানি তো তাঁরই হাতে গড়া।

কাজী আবদুল ওদুদ

···কলকাতায় যখন নজরুল এলেন তখন তাঁর বয়স বিশ বৎসর। গড়নে নাতিদীর্ঘ কিন্তু সুঠাম, ললিতশ্যাম, চোখ দুটি কিছু বেশী চঞ্চল ও উজ্জ্বল—স্নেহ মমতা কাড়বার অপূর্ব যাদু তাতে, কণ্ঠে অশান্ত গান বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের যৌবনের প্রেমের গান আর কারণে অকারণে প্রাণখোলা উচ্চ হাসি। সবাই জানের নজরুল জনপ্রিয় হয়েছিলেন অতি অল্প দিনে—তার মূলে ছিলো তাঁর এই প্রাণ প্রাচুর্যভরা মোহন নবীনতা।

অচিরে কবিতা রচনায়ও তিনি মন দিলেন। তখন জানা ছিলো না, কবিতা রচনায়, বিশেষ করে উর্দু ও বাংলা পদ মিশানা কবিতা রচনায় বালক বয়সেই তিনি অভ্যস্ত হয়েছিলেন। করাচী সেনানিবাসে এক পাঞ্জাবী হাফিজ-ভক্তের সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে হাফিজের ও ব্যাপকভাবে ফরাসী সাহিত্যের চর্চা করেন ; হাফিজের কবিতার কিছু কিছু অনুবাদ এ সময়ে তিনি করেন। দেশে এই সময়ে শুরু হয় খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন। সে আন্দোলনের তীব্রতা বেড়ে চললো, নজরুলের রচনা-শক্তিও উৎকর্ষ লাভ হতে লাগলো। তাঁর প্রথম সে কবিতাটি ব্যাপক খ্যাতি লাভ করলো, সেটির নাম 'সাত-ইল-আরব'—১৩২৭ সালে জ্যৈষ্ঠের 'মোসলেম' ভারতে প্রকাশিত হয়। বিনয় সরকার মশায় (তিনি বোধ হয় তখন ইউরোপে ছিলেন) এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। কবিতাটির একটি স্তবক এই :

'দুষ্মন-লোহু ঈষায় নীল
তব তরঙ্গে করে ঝিলমিল।
বাঁকে বাঁকে রোষে মোচড় খেয়েছে পীয়ে নীল খুন পিণ্ডারীর!
জিন্দা বীর
'জুলফিকার আর হায়দারী হাঁক হেথা আজো হজরত আলীর
সাতিল্ আরব! সাতিল-আরব। জিন্দা রেখেছে তোমার তীর।'

প্রবলভাবে ভালবাসার বা ঘৃণা করবার কাল যৌবন। অত্যাচারীর প্রতি নবীন কবির সেই প্রবল সহজ ঘৃণা অদ্ভুত রূপ পেয়েছে এর ক'টি ছত্রে। এর পরে তাঁর যে কবিতাটি ব্যাপক প্রশংসা লাভ করলো সেটি 'খেয়া-পারের তরণী—শ্রাণের' 'মোসলেম ভারতে' প্রকাশিত হয়। উক্ত পত্রেরই ভাদ্রের সংখ্যায় মোহিতলাল মজুমদার মশায় তঁরে উচ্চ প্রশংসা করেন। 'মোসলেম ভারতে'র ভাদ্রের সংখ্যায় প্রকাশিত 'কোরবাণী' কবিতাটিও জনপ্রিয় হলো; কিন্তু উক্ত পত্রের আশ্বিনের সংখ্যায় প্রকাশিত কবির 'মোহররম্' কবিতাটি বেদনায় গভীরতায় আর ছন্দ ও মিলনের অপূর্ব চাতুর্যে বাংলার রসিক-সমাজের চিত্ত একেবারে জয় করে নিলো। এর প্রথম দুটি স্তবক এই ঃ

'নীব সিয়া আসমান লালে লাল দুনিয়া,—
'আম্মা লাল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া
কাঁদে কোন্ ক্রন্দসী কার্বালা ফোরাতে,
সে কাঁদনে আসু আনে সীমারেও ছোরাতে!
রুদ্র মাতন ওঠে দুনিয়া –দামেশ্‌কে—
'জয়নালে পরালে এ খুনিয়ারা বেশ কে?'
'হায় হায় হোসেনা' ওঠে রোল ঝঞ্ঝায়।
তলওয়ার কেঁপে ওঠে এজিদের পাঞ্জায়?'

করবার আছে 'খেয়াপারের তরণী'র ও 'মোহররম্'-এর রূপ কল্পনায় মুসলমান সমাজে প্রচলিত ধারণার রদবদল করতে তিনি কিছুমাত্র চেষ্টা করেননি, শুধু তাঁর ভাবাবেগের গাঢ়তা ও অপূর্ব শব্দ-যোজনা-সামর্থ তাঁকে এমন অভাবনীয় সাফল্য দান করেছে। 'মোহরম্' কবিতাটি এক অতিশয় শক্তিশালী মর্সিয়াগীতি, তার সঙ্গে তাতে প্রকাশ পেয়েছে সেই খেলাফত আন্দোলনের যুগের মুসলমানের দিগ্‌ভ্রান্ত মানসিকতা। এর অধুনা-পরিত্যক্ত শেষ দুটি চরণ লক্ষ্যণীয়ঃ

'দুনিয়াতে দুর্মদ খুনিয়ারা ইসলাম।
লোহু লাও নাহি চাই নিষ্কাম বিশ্রাম॥

এর তিনটি কবিতা পেয়ে বাংলার রসিক সমাজ সেদিন যেরূপ অকৃত্রিম অনুরাগে নজরুলের শিরে কবি যশের মুকুট পরিয়ে দিয়েছিলেন তার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে খুব বেশী নেই। কিন্তু এমন সমঝদারির পরিচয় দিয়ে বাংলার রসিক-সমাজ সেদিন অবিবেচনার পরিচয় দেন নি। এই তিনটি বাস্তবিকই রয়েছে নজরুল-প্রতিভার পর্যাপ্ত পরিচয় যা পরবর্তীকালে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভার মহত্তর পরিচয়ের মধ্যেও আত্মপ্রকাশ করেছে বিরল ভাবেই। গদ্যের ক্ষেত্রে তাঁর এই শিল্প-প্রতিভার বিশিষ্ট পরিচয় বহন করেছে তাঁর এই যুগের পত্রোপন্যাস 'বাঁধনহারা'।

প্রমথনাথ বিশী

কাজী নজরুল ইসলামের কপালে ছাপ পড়ে গিয়েছে বিদ্রোহী কবি বলে। প্রেম ও ভক্তির কবিতা ও গানগুলি যে তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ সম্পদ তা একরকম চাপা পড়ে গেল। যৌবনের ও রাজনীতির উন্মাদনায় যে-সব কবিতার সৃষ্টি হয়েছিল সাময়িক প্রয়োজন মিটিয়ে

দিয়েও তাদের মধ্যে অবশ্যই কিছু অবশিষ্ট আছে, কিন্তু এখন আর সেই ছাপ দিয়ে কবিকে চিহ্নিত করবার চেষ্টা শুধু নিরর্থক নয়, কবির খ্যাতির পক্ষে ক্ষতিকর।

এমন যে হয়ে থাকে তার কারণ অধিকাংশ মানুষ জহুরি নয়; সোনার মূল্য বুঝবার ক্ষমতা তাদের নেই, সোনার উপরে রাজার মুখের ছাপ দেখতে পেলে তারা নিশ্চিন্ত হয়। সোনার ক্ষেত্রেও যা সত্যাপম কাব্যের ক্ষেত্রে তা সত্য। প্রকৃত জম কাব্যাঙ্ক, নিজেদের বিচার করবার শক্তি না থাকায় ফরমূলার সন্ধানে থাকে। সাহিত্য ক্ষেত্রে সেইজন্য ফরমূলার বড় আদর। রবীন্দ্রনাথ মিসটিক (কাব্যে মিস্‌টিসিজম সোনার পাথরবাটি) সত্যেন্দ্র দত্ত ছান্দসিক, নজরুল ইসলাম বিদ্রোহী।

নজরুলের বিদ্রোহত্মক কবিতাগুলির মূল্য অস্বীকার না ক'রেও বলা চলে সে মূল্য দিয়ে তার চূড়ান্ত বিচার হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্‌ সঙ্গীত বাঙালী রচিত সবচেয়ে সুপরিচিত গান। কিন্তু গানটিকে কি বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত-মূল্য বিচারের কষ্টিপাথর রূপে ব্যবহার করা উচিত? বিদ্রোহহাত্মক কবিতাগুলি নজরুলের সাহিত্যমূল্য বিচারের কষ্টিপাথর নয়। তবে কিনা সাহিত্যের বাজারে সকলে তো মূল্যবিচারের উদ্দেশ্যে যায় না; নানা কারণে যায় —যার সঙ্গে সাহিত্যের যোগ অত্যন্ত পরোক্ষ।

নজরুলের যে সব গুণগ্রাহী ও অনুরাগী এখনো বিদ্রোহত্মক কবিতাগুলিকেই তাঁর শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে ঘোষণা করেন, রাজনৈতিক স্বার্থসাধনের আশায় অন্য কবিতাগুলিকে আড়ালে ফেলে রাখেন তাঁরা আর যাই হোন, কবির যথার্থ বন্ধু নন। রাজনৈতিক উন্মাদনার দিনে যে-সব কবিতা লিখিত হয়েছিল তার প্রাপ্য সম্মান ও খ্যাতি কবি লাভ করেছেন। তবে তা লাভ করেছেন একটা বিশেষ কালের হাত থেকে। তারপরে অর্ধ শতাব্দী প্রায় গত হয়েছে, এখন দেখা উচিত কবি যাতে পরবর্তীকালের, যা নাকি চিরকালের অগ্রদূত, হাত

থেকে স্থায়ী সম্মান লাভ করতে পারেন। কবি এখন জীবন্মৃত। আমাদের মধ্যে বাস করেও যেন নেই। তিনি সক্রিয় এ সতেজ থাকলে কি বলতেন জানি না, কিন্তু বিশ্বাস করতে ভালো লাগে যে রূঢ় দেশাত্মবোধক উন্মাদনার উর্ধ্বে উন্নীত হতেন। সমকালেরে সাধনাকে চিরকালের অভিমুখে প্রেরিত করতেন। এই বিশ্বাসের সমর্থনের হেতু তাঁর পরবর্তী রচনাসমূহের মধ্যে আছে। নজরুলের শ্রেষ্ঠ কাব্য-সম্পদ তাঁর বিদ্রোহত্মক কবিতা নয়—ভক্তি ও প্রেমের কবিতা ও গান, যার অনেকগুলিই বাংলা ভাষায় অমূল্য সম্পদ। তবে যে আমরা এখনো উন্মাদনার কবিতাগুলি নিয়ে মাতামাতি করছি তার কারণ অদ্যাবধি আমার পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে আছি কবি এগিয়ে গিয়েছেন। তাঁর ও আমাদের মধ্যে কম ক'রে পঞ্চাশ বছরের ব্যবধান।

রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত প্রভৃতি বহু কবি সাময়িক প্রয়োজনে স্বদেশী গান রচনা করেছেন; সাময়িক প্রয়োজন মিটে গেলেও যদি তাদের মূল্য থাকে তবে তা সাহিত্যমূল্য। সেই ক্ষয়িত সাহিত্যমূল্য দিয়েই কি তাদের বিচার করতে হবে? নজরুলের অনেক স্বদেশী গান ও কবিতার কিছু সাহিত্যমূল্য অবশিষ্ট আছে। সেই ক্ষয়বিশিষ্ট্য মূল্য দিয়েই কি আমরা কবির প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়ে তাঁর প্রতি দায়িত্ব শোধ করতে চাই? আশঙ্কা হচ্ছে সাহিত্য বিচারের মধ্যে রাজনীতির স্থূল হস্ত প্রবিষ্ট হওয়াতেই এমন বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। যাঁরা এই কাজটিতে নেমেছেন, জানেন যে কবির বাধ্যতামূলক নীরবতা। কাজেই তাঁরা নিজেরাই উত্তোর চাপানোর ভার নিয়েছেন। কবির পক্ষে অবস্থাগতিকে—'অন্য সবাই কইবে কথা তুমি রইবে নিরুত্তর'। অসহায় কবিকে নিয়ে সাহিত্য বিচারের নামে যারা সঙ্কীর্ণ রাজনীতির খেলায় মেতেছেন তাঁরা না কবির অনুরাগী না সাহিত্যের।

নারায়ণ চৌধুরী

…কাজী সাহেবের কবি-প্রকৃতির দুই দিক—প্রথমতঃ, তিনি নির্যাতিত শোষিত সর্বহারা শ্রেণীর মানুষের প্রতি অপরিমেয় দরদ প্রকাশ করে বাংলা কবিতার প্রচলিত সংস্কারকে আঘাত করেছেন ; দ্বিতীয়তঃ, তিনি…কৃত্রিম বিধিনিষেধ আর অনুশাসনের নিগড় ভাঙতে চেয়েছেন। তাঁর করিতায় প্রবৃত্তির একটা প্রচণ্ড উদ্দামতা লক্ষ্য করা যায়।…

কাব্যজীবনের একটি বিশেষ পর্বে এসে কবি আর বাণীরূপেই শুধু তৃপ্ত থাকতে পারেননি, তিনি সুররূপের ধ্যানেও নিবিষ্ট হলেন। কবি অসি ছেড়ে বাঁশী ধরলেন। সুর-রূপী মর্মবাঁশীর লীলা তাঁর মন কেড়ে নিলো! সে বাঁশীর সুর যে পরবর্তী অধ্যায়ে কতো বিচিত্র ভঙ্গিমায় আর ঢঙে প্রকাশিত হয়েছে তা কবি রচিত অজস্র গানের শ্রেণী-বৈচিত্র্য লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। এতো বেশি সংখ্যক গান [কাজী নজরুল ইসলাম সবশুদ্ধ আনুমানিক তিন হাজার গান রচনা করেছেন। পৃথিবীর সঙ্গীত রচনার ইতিহাসে এইটেই বোধহয় সর্বোচ্চ রেকর্ড। রবীন্দ্রনাথের গানের সংখ্যা আনুমানিক আড়াই হাজার।] আর এত বিচিত্র ঢঙের গান বাংলা দেশের অন্য কোন সুরকার আজ পর্যন্ত রচনা করেন নি। এ থেকে এই কথা এক প্রকার বিনা দ্বিধায়ই বলা চলে যে, সঙ্গীত আর কবিতার মধ্যে সঙ্গীতই নজরুলের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের অধিক সহায়ক ছিলো, তাঁর আত্মপ্রকাশের উপযুক্ততর মাধ্যম ছিলো। সঙ্গীতে তিনি দেশপ্রেম, যৌনচেতনা, প্রেম, ভক্তি, নিসর্গ প্রীতি, নারীর মর্যাদার বিশ্বাস, গণমুক্তির প্রতি আস্থা প্রভৃতি বিচিত্র মনোভাবকে প্রকাশ করেছেন। তাঁর কাব্যেও এ সকল ভাবেরই প্রাধান্য, তবে সঙ্গীতে সে প্রকাশ অধিকতর নিপুণতার সঙ্গে সংশোধিত হয়েছে সে-কথা বলা দরকার। কেননা এ ক্ষেত্রে বাণীর মাধুর্যের উপর অতিরিক্ত একটি গুণ আরোপিত

হয়েছে—সুর-সৌন্দর্য। বাণী আর সুরে মিলে কাজী নজরুলের অদম্য প্রাণের আবেগ চমৎকার এক সুসামঞ্জস শিল্পরূপ লাভ করেছে।

নজরুল সঙ্গীতজীবনের সূত্রপাত করেন বাংলা গজল রচনার দ্বারা। বাংলা ভাষায় এ জিনিস একেবারেই অভিনব।...

উর্দুতে এই ধরনের গান অনেক আছে। উর্দু কবি গালিবের একাধিক গজল রচনা বিদ্যমান। নজরুল গজল গান বাংলায় বিধিবদ্ধভাবে প্রবর্তন করেন। এক সময় বাংলার আকাশে-বাতাসে নজরুলের গজল গান ভেসে বেড়িয়েছে...আজ সে-সব গান কারও মুখে শোনা যায় না, তবে এক সময়ে মুটে-মজুর, গাড়োয়ান, রিক্সাওয়ালা প্রভৃতি খেটে-খাওয়া মেহনতী মানুষের মুখেও এই সকল গানের কলি সদাসর্বদা সঞ্চরণ করে ফিরেছে। এ থেকেই গানগুলির ব্যাপক জনপ্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়—

'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিসনে আজি দোল,'
'আমার চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী,'
'চেয়ো না সুনয়না, আর চেয়ো না এই নয়ন পানে,'
'এত জল ও কাজল চোখে পাষাণী আনলে বল কে,
'কেন আন ফুলডোর এ বিদায় বেলায়,'
'নহে নহে প্রিয়, এ নয় আঁখিজল,'

প্রভৃতি তাঁর বহুখ্যাত গানগুলির কয়েকটির প্রথম পদ। এ সকল গান এক সময়ে দিলীপকুমার রায়, ইন্দুবালা, কমলা ঝরিয়া, শচীন দেব বর্মন প্রমুখ প্রসিদ্ধ গায়কগণ জনসমাজে প্রচার করেছেন।

বাংলার জাতীয়তাবাদী মুক্তি-সংগ্রামের অধ্যায়ে নজরুল রচিত 'কোরাস' গান যৌথ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে একটি মূল্যবান যোজনা। অত্যাচারী বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ গণমানবের প্রতিরোধ-স্পৃহা আর সংগ্রাম-চেতনা এই সকল কোরাস গানের দ্বারা যে

কতখানি অনুপ্রাণিত হয়েছিলো তা বলে বোঝানো যায় না। নজরুলের আগেও অবশ্য বাংলায় কোরাস গান রচিত হয়েছে—দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ প্রমুখ প্রখ্যাত কবি-গীতিকারগণ কোরাস গান রচনা করেছেন, তবে এ ক্ষেত্রে নজরুলের দানও বড়ো কম নয়। তাঁর প্রসিদ্ধ কোরাস 'দুর্গম গিরি কান্তর মরু দুস্তর পারাবার' গানের সত্যিই তুলনা খুঁজে পাওয়া ভার। এটি বাংলা দেশের একটি অত্যুৎকৃষ্ট কোরাস সঙ্গীত। এ গানটি কবি, সুভাষচন্দ্রের দ্বারা উপরুদ্ধ হয়ে একটি বিশেষ উপলক্ষ্যের জন্য রচনা করেছিলেন, তার সে রচনা সর্বাঙ্গ সার্থক হয়েছিলো। তা ছাড়া কোরাস গানের একটি বিশেষ ধারা—'মার্চ সঙ্গীত'—এ গানে নজরুলের জুড়ি নেই। নজরুলের মার্চ সঙ্গীত, যথা, 'উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল নিম্নে উতলা ধরণীতল' ইত্যাদি, কিংবা 'টলমল টলমল পাদভরে বীরদল চলে সমরে, ইত্যাদি গান কে না শুনছেন ?

কাজী সাহেব নানা শ্রেণীর আর নানান্ ধরনের গান রচনা করেছিলেন। এই সব গানের মধ্যে আছে—ইসলামী সঙ্গীত নদীর গান, ছাদ পেটানো গান, ঝুমুর, ভাটিয়ালি, লাউনি, গীত, আরবী সঙ্গীত, দক্ষিণ সমুদ্র দ্বীপের গান, চীনা সঙ্গীত ; কতো নাম করবো। এছাড়া শেষ বয়সে তিনি আধ্যাত্মভাবের প্রেরণায় শ্যামসঙ্গীত আর কীর্তনও অনেক রচনা করেছেন।

আব্বাসউদ্দীন আহম্মদ

…১৯৫০ সনে প্রথম গান রেকর্ড করে কুচবিহারে চলে আসি। ১৯৩১ সনে আবার কলকাতা যাই এবং স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করি। গ্রামাফোন কোম্পানীর রিহার্সাল-ঘর তখন চিৎপুর রোডে। শুনলাম কাজী সাহেব রোজই সেখানে যান। এক ভদ্রলোককে

জিজ্ঞেস করলাম, 'কাজী সাহেব কোথায় ?' তিনি বললেন, 'পাশের ঘরে গান লিখছেন।' আমি ঢুকলাম। তিনি মহা উৎসাহে বলে উঠলেন, 'আরে আব্বাস, তুমি কবে এলে ? বস বস।' সর্বনাশ, এই কী কাজী সাহেব ! চোহারায় কি পরিবর্তন। এক বৎসর আগে কুচবিহারে হে কাজী সাহেবকে দেখেছি তিনি যে এমন ভাবে বদলে যেতে পারেন স্বপ্নেও ভাবিনি ঃ তখন ছিলো ইয়া বড় গোঁফ, দোহারা চেহারা, মাথার ঢেউ-খেলানো বাবরী। তাঁর মাথার চুল ঠিকই আছে—গোঁফজোড়া অদৃশ্য হয়েছে আর বুকখানি হয়েছে নাদুসনুদুস। চোখে আগে জ্বলতো বিদ্রোহের আগুন, এখন সেখানে এসেছে শ্রাবণের ঢল। সামনে এগিয়ে কদমবুছি করলাম। তিনি বললেন, 'সবাই আমাকে কাজী সাহেব বলে, তুমি কিন্তু কাজীদা বলে ডাকবে আমাকে। হ্যাঁ, তোমার জন্যে গান লিখতে হয়। আচ্ছা ঠিক হবে।'

'আচ্ছা ঠিক হবে, তো বললেন, কিন্তু যতবারই যাই গ্রামোফোন ক্লাবে ততবারই দেখি তাঁকে ঘিরে রয়েছেন অনেক। আমি সঙ্কোচে কিছুই বলতে পারি না। পাশের ঘর পিয়ারু কাওয়াল রিহার্সাল দিচ্ছেন উর্দু কাওয়ালী গানের ! বাজারে সে-সব গানের কী বিক্রী। আমি কাজীদাকে বললাম, 'এমনিভাবে বাংলা কাওয়ালী গান লিখে দিতে পারেন আমার জন্যে ?' গ্রামোফোন কোম্পানীর বাঙালী সাহেব বললেন, 'না না, ও ধরনের বাংলা গান বিক্রী হবে না।' অবশেষে প্রায় এক বৎসর পরে সাহেব রাজী হলেন। কাজীদাকে বললাম, 'সাহেব রাজী হয়েছেন ! কাজীদা তখুনি আমাকে নিয়ে একটা কামরায় ঢুকে বললেন, 'কিছু পান নিয়ে এসো।' পান নিয়ে এলাম ঠোঙা ভর্তি করে। তিনি বললেন, 'দরজা বন্ধ করে দিয়ে চুপ করে বসে থাকে।' ঠিক ১৫-২০ মিনিটের মধ্যে লিখে ফেললেন 'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ।' সুর-সংযোগ করে তখুনি শিখিয়ে দিলেন গানটা। বললেন, 'কাল থেকো রেকর্ডের অপর পৃষ্ঠার জন্যে আর একখানা লিখে দেবো।' পরদিন লিখলেন

'ইসলামের ঐ সওদা নিয়ে এলো নবীন সওদাগর।' রেকর্ড করলাম চারদিন পরে। সে গান বাংলার আকাশে-বাতাসে তুললো এক নব আলোড়ন। তারপর লিখে চললেন এইভাবে বহু ইসলামী গান।

দু'তিন বৎসর পরে। একদিন রিহার্সাল রুমে বসে একাকী আমদের দেশের একখানা পল্লী গান ভাওরাইয়া গাইছিলাম। কাজীদা কখন এসে সে দরজায় দাঁড়িয়ে চুপ করে শুনছিলেন, টের পাইনি। গান শেষ করা মাত্র তিনি ঢুকে বললেন, আহা কী সুন্দর মিষ্টি সুর! আব্বাস গাও—আর একবার গাও তো। আমি গাইলাম ঃ

নদীর নাম সই কচুরা
মাছ মারে মাছুয়া
মুই নারী দিচোঙ ছ্যাকা পাড়া

কাজীদা বললেন গাও আবার গাও। পাঁচ-ছবার গাইলাম। তিনি বললেন আচ্ছা চুপ করে বসো। তিনি কাগজ কলম নিয়ে গান লিখতে বসলেন। ১০ মিনিট পরে কাগজখানা এগিয়ে দিয়ে বললেন দেখো তো তোমার সুরের সাথে আমার এ গান ঠিক মিলে যায়নি?' আমি তাঁর লেখা গান গাইলাম ঃ

'নদীর নাম সই অঞ্জনা
নাচে তীরে খঞ্জনা
পাখী সে নয় নাচে কালো আঁখি।'

এর পর তিনি ভাওয়াইয়া গান শুনলে অস্থির হয়ে পড়তেন। গান গাইতে গাইতে গলা ভাঙার মাধুর্য্যে তিনি আত্মহারা হয়ে 'আহা আহা' করে উঠতেন। আর একটা গান লেখার কথা মনে পড়েছে। আমি একদিন কাজীদাকে গেয়ে শোনালাম ঃ

তেরষা নদীর পারে পারে ও
দিদি লো মান্‌সাই নদীর পারে
আজি সোনার বধু গান করি যায় ও
দিদি তোরে কি মোরে কি
শোনেক দিদি ও।'

কাজীদা সেই সুরে লিখলেন ঃ

'পদ্মদীঘির ধারে ধারে ওঁ'

ভাওয়াইয়া সুরে লিখলেন ঃ

'কুচ বরণ কন্যা রে তার মেঘ বরণ কেশ,
আমায় নিয়ে যাও রে নদী সেই কন্যার দেশ।'

পল্লী-সঙ্গীত লেখার অনুপ্রেরণা তিনি এইভাবে পেলেন। তখন আমার জন্য আট-দশখানা পল্লী-সঙ্গীত লিখেছিলেন তার মধ্যে বেঁচে রইলো 'বন্ধু আজো মনে পড়ে আম-কুড়ানো খেলা,' 'গাঙে জোয়ার এলো ফিরে তুমি এলে কই', 'ওরে কে বলে আরবে নদী নায়, আরে ও দরিয়ায় মাঝি, মোরে নিয়ে যাবে মদিনা' এবং 'উঠুক তুফান পাপ দরিয়ায়, আমি কি তায় ভয় করি।'

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ। একদিন গ্রামোফোন কোম্পানিতে কাজীদা এবং আরো অনেকে মিলে জোর আড্ডা বসে গেছে। আমি গেলাম। কিছুক্ষণ পরে খুব ঘটা করে মেঘ এলো, এলো বাদল। কাজীদা অকস্মাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। কখন যেন কাগজ-কলম ধরেছেন। আধঘণ্টা পরে হারমোনিয়ামটি টেনে নিয়ে গুনগুন করে সুর ভাঁজতে শুরু করলেন। আমাকে তাঁর কাছে ডাকলেন, বললেন, 'নাও, সুরটা তুলে নাও—বর্ষা আসছে, বর্ষার আবাহন-গীতি লিখলাম।' গান হলো ঃ

'স্নিগ্ধ শ্যাম বেণী বর্ণ
এস মালবিকা।

অর্জুনমঞ্জরী কণে

গলে নীপ মালিকা

মালবিকা ॥'

কাজীদার বাড়ীতে একদিন বসে আছি। কারমাইকেল হোস্টেল থেকে চার-পাঁচজন ছাত্র এসে কাজীদাকে বললেন, "কাজী সাহেব, আমাদের হোস্টেলে আসছেন তুরস্ক থেকে হালিদা এদির হানুম, তাঁকে আমরা অভ্যর্থনা জানাবো, আপনাকে সভাপতি হতে হবে।' কাজীদা বললেন, 'আচ্ছা যাবো তোমরা যাও। ছেলেরা চলে গেলো। কাজীদা আমাকে বললেন, 'জানো আব্বাস, এই হালিদা এদিব হচ্ছেন তুরস্কের নারী জাগরণের অগ্রদূতী। এঁর অভ্যর্থনা-সভায় নিশ্চয়ই যাবো, কিন্তু তোমাকে বললো না, হয়তো চেনে না, কিন্তু আমি বলছি—নিশ্চয়ই যাবে।' আমি বললাম, 'কাজীদা যাবো নিশ্চয়ই। কিন্তু আপনি যাবেন আপনার কবিতার সওগাত নিয়ে, আমি কী নিয়ে যাবো ?' তিনি বললেন, 'ওঃ—আচ্ছা।' তারপর কাগজ-কলম নিয়ে বসলেন। কী অপূর্ব গানই না লিখে দিলেন! বললেন, 'এ গানে তুমি নিজে সুর দেবে।' গান তো নিয়ে এলাম। কাজীদার গানে আমি সুর দেবো, এতবড়ো ধৃষ্টতা আমার নেই। অথচ তাঁর আদেশে বাসায় হারমোনিয়াম নিয়ে বসলাম। সৌভাগ্যক্রমে আমার বাসায় এলো ওস্তাদ জমিরুদ্দিন খাঁর ছেলে মরহুম আবদুল করিম খাঁ ওরফে বালী। বললাম, 'ভাই, উদ্ধার করো—এ যে বিরাট পরীক্ষা; কাজীদার গান, আমাকে সুর দিতে বলেছেন।' বালী প্রথম স্তবকে সুর সংযোগ করলে, তারপর বললো, 'এইভাবে করতে থাকো।' পরদিন সমস্ত গানটা যখন গেয়ে শোনালাম, কাজীদা মহা খুশী। গানটা হচ্ছে ঃ 'গুণে গরিমায় আমাদের নারী।'

মুসলমানদের এক একটা পর্ব আসতো আর আমি কাজীদাকে অনুরোধ করতাম, 'কাজীদা মোহর্‌রম মাস আসছে, মর্সিয়া লিখে দিন।' তিনি লিখেছেন, 'মোহর্‌রমের চাঁদ এলো ঐ কাঁদতে ফের

দুনিয়ায়,' 'ওগো মা ফতেমা ছুটে আয়, তোর দুলালের বুকে হানে ছুরি', 'ফোরাতের পানিতে নেমে ফতেমা দুলাল কাঁদে অঘোর নয়নে রে।' আসে ফাতোহা-দোহাজদাহাম ; কবি লেখেন :

'নিখিল ঘুমে অচেতন সহসা শুনিয়া আজান,
শুনি সে তক্‌বীরের ধ্বনি আকুল হল মমপ্রাণ।
বাহিরে হেরিনু আসি বেহেশ্‌তী রৌশনীতে রে
ছেয়েছে জমীন ও আসমান ;
আনন্দে গাহিয়া ফেরে ফেরেশতা হুর গেলেমাম—
এলো কে—কে এলো ভূলোকে
দুনিয়া দুলিয়া উঠিল পুলকে।'

জাকাত, সম্বন্ধে কবিতে লিখতে বলেছি ; তিনি তৎক্ষণাৎ লিখে দিয়েছেন :

'দে জাকাত দে জাকাত, তেরো দে রে জাকাত—
তোর দিল্‌ খুলবে পরে, ওরে আগে খুলুক হাত।'

হজ্ব সম্বন্ধে লিখেছেন :

চল্‌ রে কাবার জিয়ারতে, চল্‌ নবিজীর দেশ ;
দুনিয়াদারীর লেবাস খুলে পর রে হাজীর বেশ।

একদিন কাজীদা বলেন, 'আব্বাস, সুন্দর একটা গান লিখেছি, গানটা শেখো, খুব তাড়াতাড়ি রেকর্ড করতে হবে। গানের কথা হচ্ছে :

'ত্রাণ কর মওলা মদিনার—
উম্মত তোমার গুনাহ্‌গার কাঁদে
তব প্রিয় মুসলিম দুনিয়ায়
পড়েছে আবার গোনাহের ফাঁদে
নাহি দান খয়রাত, ভুলে মোহ ফাঁসে
মাতিয়াছে সবে বিভরে বিলাসে ;
বসিয়াছে জালিম শাহী তখ্‌তে তবে,

মজ্‌লুমের এ ফরিয়াদ আর কারে কব—
তলোয়ার নাহি নাহি আর
পায়ে গোলামীর জিঞ্জির বাধে।'

গ্রামোফোন কোম্পানীর রিহার্সাল রুমে তাঁর গানের বড়ো-বড়ো খাতাগুলো পড়ে থাকতো। সেই খাতা থেকে কোনো-কোনো নতুন কবি গান লিখে নিয়ে কাজীদার লাইন শুদ্ধ প্রায় হুবহু নকল করে নিজের লেখা বলে গ্রামোফোনে চালাবার চেষ্টা করতে লাগলো। কাজীদাকে বললাম সে-কথা তিনি হেসে বললেন, 'দূর পাগল, মহাসমুদ্র থেকে ক'ঘটি পানি নিলে কি সাগর শুকিয়ে যাবে? আর নবাগতের দল এক-আটটু না নিলে হালে পানি পাবে কী করে?'

বিশ বৎসর প্রায় কাজীদার সাহচর্যে ছিলাম; এর মধ্যে একদিনও তাঁর মুখে পরনিন্দা শুনিনি।

—গেয়ে উঠলো তার কণ্ঠ, দুর্গম গিরি, দুস্তর পারাবার পার হবার আহ্বান জানালেন তিনি—জিজ্ঞেস করলেন:

'ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেলো যারা
জীবনের জয়গান
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা,
দিবে কোন্ বলিদান?

তারপর সত্যিকারের চারণের মতোই দুঃসাহসিক আশ্বাস দিলেন:

'এই গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর
উদিবে সে রবি আমাদের খুনে রাঙিয়া পুনর্বার'

চারণ কবি হয়ে পুনরায় ফিরে আসাই হয়তো সত্যিকারের নজরুল ইসলাম। হয়তো নজরুল ইসলামই বাংলার শেষ চারণকবি। চারণকবির কণ্ঠ থেকেই বিদ্রোহী বিদ্রোহের সুর শিখে নেয়, কবি খুঁজে নেয় কবিতার উপাদান, রক্ত নেচে ওঠে সৈনিকের ধমনিতে। আর তারই স্মৃতি বহুদিন; বহু যুগ ঘুরে বেড়ায় আমাদের মনে।

মুহম্মদ আবদুল হাই

বাংলা সাহিত্যে নজরুল ইসলাম একটা ব্যতিক্রম। নেতিয়েপড়া সুরের দেশে কাব্যে এবং সঙ্গীতে তিনি প্রলয় নিনাদ তুলেছিলেন। অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিমাণের গদ্য রচনাতেও ব্যতিক্রমের সুর সুস্পষ্ট সাহিত্য সমালোচনার মানদণ্ডে উপন্যাসে দেশ-কালের পরিপ্রেক্ষিতে কাহিনী নির্মাণ, চরিত্র চিত্রণ, ঘটনা সংস্থান প্রভৃতি বিষয়ে যে ঐক্য ও বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, নজরুলের উপন্যাসত্রয়ীতে তা নেই।

সমালোচনার শ্রেষ্ঠ মানদণ্ড হাতে নিয়ে ঔপন্যাসিক হিসাবে নজরুলকে বিচার করলে একদিকে যেমন তাঁর অনেক ত্রুটি পাওয়া যাবে, যেমনি এ ত্রুটিগুলোই যে তাঁর ব্যতিক্রম এবং বৈশিষ্ট্য-নির্দেশক হয়ে রয়েছে, সমালোচককে তাও স্বীকার করতে হবে।

একটা যুগের স্রষ্টা হিসাবেই নজরুল বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিক ধারায় একটা ব্যতিক্রম হয়ে রয়েছে। নজরুল প্রতিভার ছোঁয়া সাহিত্যের যে ধারায় লেগেছে, তাতেই বৈচিত্র্যের সৃষ্টি কম হয়নি। উপন্যাস রচনাতেও তাই দেখা যায়, তিনি গতানুগতিকতা পথে পা বাড়াননি।

প্রথম যুদ্ধের পর থেকে বাংলার বিপ্লব বা সন্ত্রাসবাদের কাল পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৩০—৩২ সাল পর্যন্ত নজরুল, রবীন্দ্রনাথের যুগেই রবীন্দ্রনাথকেও অতিক্রম করে একটা স্বতন্ত্র যুগের সূচনা করেছিলেন। এ-যুগ বাংলাদেশের তথা অবিভক্ত ভারতের মানস-চাঞ্চল্য ও অস্থিরতার যুগ। প্রথম মহাযুদ্ধে মিত্রশক্তি জয়ী হলেও ব্রিটিশ রাজ-শক্তির পতনোন্মুখ রূপ এ উপমহাদেশের অগণিত তরুণ মনে আশার সঞ্চার করে। এ দেশ স্বাধীন না হলে দেশের আত্মা জাগ্রত হবে না। বুভুক্ষু মানুষের ক্ষুধারও আবাস হবে না। তাদের এ বিশ্বাসকে আরও

দৃঢ়ভূত করেছিলো এ কালের নতুন সমাজবাদ-ভিত্তিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা। গান্ধীজীর আন্দোলনের পথে এদেশবাসী আকৃষ্ট হলেও বাংলার তরুণদের প্রাণে তার আবেদন তেমন প্রবল হয়নি। বাংলার তরুণেরা অহিংস পথ অবলম্বন না করে দেশের মুক্তির জন্য বিপ্লব ও সন্ত্রাসের অহিংস পথই বেছে নিয়েছিলো। এ যুগের মানস-চাঞ্চল্য, অস্থিরতা ও বেদনাকে যুগের চারণ-কবি হিসাবে নজরুল তাঁর কাব্যে ও গানে মুখরিত করে তুলেছিলেন আর তাঁর উপন্যাসত্রয়ীতে এঁকেছিলেন এ যুগেরই জীবন্ত প্রতিরূপ। বাংলার যে অক্ষয় যৌবনের সে-সময় মুক্তিকামী ভারতবাসীর নেতৃত্ব করেছে, দেশের আজাদীকে ত্বরান্বিত করার জন্য যে তরুণ-তরুণীরা ফাঁসীমঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে গেছে দেশ-প্রেমিক সেই সর্বহারার দলের জীবনলেখা রচনা করেছেন নজরুল তাঁর 'কুহেলিকা' এবং 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে! এদের পথ ছিলো দৃঢ় বাসনা, ছিলো আদম্য। দেশোদ্ধারই ছিলো তাদের একটি মাত্র 'প্লট'। ষড়যন্ত্র যতই করুক না কেন, তাতে কোনো জটিলতা ছিলো না। দিনের আলোর মতই তা ছিলো সুস্পষ্ট। 'কুহেলিকা' উপন্যাসের নায়ক জাহাঙ্গীর ওরফে বুলবুলুন আর 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের নায়ক আনসাবকে তাই জীবনের সকল দেনা-পাওনার বাঁধন দু'হাত দিয়ে ছাড়িয়ে এক প্রবল-নেশায় মেতে উঠতে দেখি। মায়ের স্নেহ, আত্মীয়-আত্মীয়ার আদর-যত্ন অবহেলা করে দেশের স্বাধীনতার দুরূহ ব্রতে জীবনকে বারংবার এরা বিপ্লব-বাহ্নির করাল কবলে সমর্পণ করেছে, তবু সরাজয় স্বীকার করেনি।

'মৃত্যুক্ষুধা'ই নজরুলের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। পেটের ক্ষুধা মানুষকে তিলে তিলে কিভাবে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়, তার-ধর্ম-বিশ্বাস এবং জন্মার্জিত সংস্কার কিভাবে শিথিল হয়ে ওঠে, অত্যন্ত বাস্তবধর্মী দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে নজরুল তার ছবি এঁকেছেন এ উপন্যাসে। কৃষ্ণনগরে চাঁদসড়কের একটি দরিদ্র মুসলমান পরিবার ক্ষুধার তাড়নায় কিভাবে ধুঁকে মরছে তার নিখুঁত এবং জ্বলন্ত বর্ণনা দিয়েছেন নজরুল।

এ কাহিনীর সঙ্গে সুগ্রথিত হয়েছে বিপ্লবী আনসারের দেশসেবা, কারাবরণ ও আত্মত্যাগের করুণ ইতিহাস।

'কুহেলিকা' এবং 'মৃত্যুক্ষুধা'য় নজরুলের জীবন-দর্শন রূপায়িত হয়েছে বিভিন্ন চরিত্রে এবং তাদের দেশমাতৃকার মুক্তিপণের জন্য জীবন বলিদানে। কিন্তু নজরুলের সমগ্র ব্যক্তিত্বে পরিচয় বোধ হয় আমরা পাই তাঁর 'বাঁধনহারা' পত্রোপন্যাসে। 'বাঁধনহারা' নামটি এ উপন্যাসের প্রকৃতি এবং গ্রন্থকারের মানসের পরিচয় বহন করছে।

উল্কা এবং ঝঙ্কার বেগে নজরুল বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করে করেছিলেন পূর্ণিমার চাঁদের মতো ধীরে-ধীরে ষোলকলায় তিনি বর্ধিত ও বিকশিত হন নি। যুদ্ধক্ষেত্রে গোলা-গুলি তলোয়ার সঞ্চালন করতে গিয়ে মসীযুদ্ধেও তিনি হাত পাকিয়েছে।

নজরুলের উপন্যাসত্রয়ীতে কাহিনীর গাঢ় বিন্যাস এবং উজ্জ্বল চরিত্র চিত্রণ আমরা পাইনে সত্য, কিন্তু তাঁর কবি-জীবনের স্বপ্ন ও সাধ, কবিতা ও সঙ্গীত যেমন, এগুলোতেও তেমনি বিধৃত হয়েছে। ভাষার উপরে নজরুলের যে কতোবড় দখল ছিলো তাও জানা যায় তাঁর ও উপন্যাসগুলিতে।

তাঁর উপন্যাসে আমরা নজরুলের পূর্ণ ব্যক্তিত্বকে প্রস্ফুটিত দেখতে পাই।

ইব্রাহিম খাঁ

…প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। ইংরেজ-করাসী ইটালী-আমেরিকার রণ-ক্লান্ত সৈন্যরা ঘরে ফিরেছে: পথে-ঘাটে, হাটে-মাঠে শহরে-বন্দরে, বিজয়-অভিনন্দনে তাদেরকে অভ্যর্থনা করা হচ্ছে। দীর্ঘদিনের আশা-উন্মেষ বুকে নিয়ে প্রতীক্ষমান এই উপমহাদেশ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে চেয়ে আছে: হিন্দু-মুসলমান মিলে জগতের দিকে-দিকে

লড়াইয়ের বিভিন্ন ময়দানে ইংরেজ পক্ষে জয়ের জন্য যে-অর্থ যে রক্ত যে প্রাণ দিয়েছে তার বিনিময়ে চায় তারা দেশের স্বাধীনতা—ষোল আনা না হয় অন্ততঃ আংশিক। আর মুসলমানরা আরো চায় যে, তুর্ক সাম্রাজ্য রাখা হোক অক্ষুণ্ণ—যেমত জবান দেওয়া হয়েছিলো। ইংরেজ এর কোনটাতেই রাজী হতে পারলো না। তখন ধূমায়িত হতে শুরু করলো দেশের স্বাধীনতা-সাধকদের অসন্তোষের অনির্বাণ বহ্নি।

দেশের এই ক্ষুব্ধ মুহূর্তে সহসা নজরুল ইসলামের কলমে নব-জীবনের বাণী মূর্ত হয়ে উঠলো। মনে আছে, আমাদের বিদ্যালয়ের এক হিন্দু পণ্ডিত একদিন মহোল্লাসে এসে আমাকে বললেন, দেখুন দেখুন, একটা নতুন রকমের কবিতা—এ যেন রামধনুর বিচিত্র রূপসজ্জার জায়গায় জ্বলন্ত পাখা-প্রহারে ঝিলিক দিয়ে বেড়াচ্ছে এক প্রদীপ্ত বিদ্যুতের দুরন্ত বলাকা! দেখলাম, তিনি, 'শাতিল আরব' কবিতাটি নিয়ে এমন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন। আমারও কাছে ও কবিতা তখন অদ্ভুতই লেগেছিলো। তখন সাকুল্য কবিতাটাই মুখস্থ হয়ে গেছিলো। এখনও দু-চার লাইন মনে পড়ে।

'শাতিল আরব! শাতিল আরব! পুতঃ যুগে যুগে তোমার তীর
শহীদের লহু, দিলীরের খুন ঢেলেছে যেখানে আরব বীর।'
শমশের হাতে আঁসু আঁসু আঁখে হেথা মূর্তি দেখেছি বীর নারীর।

আমাদেরই ভাই লিখতে পারে, আগুনের ভাষায় লিখতে পারে, মুসলমানের নিত্য-ব্যবহার্য শব্দ দিয়ে অপরূপসুন্দর করে লিখতে পরে, মুসলমানের অতীত কীর্ত মহিমার কথা রক্তাশ্রুময় দরদ দিয়ে লিখতে পারে, এই কবিতায় তা প্রমাণিত হলো। সেদিন এ কবিতায় বিজলী জীবনের তরুণ পাতায় আগুরের অলিখিত আখেরে যা লিখেছিলো তা কি আজ সম্পূর্ণ মুছে গেছে? সবখানি যে মুছে যায়নি তা মনে করি এই জন্য যে, আজো তো এ কবিতা পড়ে মন নেচে ওঠে আজো করিব সাথে দীর্ঘনিঃশ্বাষ ফেলি আর বলি:

'শহীদের দেশ ! বিদায় বিদায় ! এ অভাগা আজ নোয়ায় শির।

তরীকুল আলম বলে একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট 'কোরবানী'কে বর্বর যুগের চিহ্ন বলে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তরীকুল আলাম ভালো লেখাপড়া জানতেন এবং সে পাণ্ডিত্যর জন্য তাঁর দাবীও ছিলো, গর্বও ছিলো। অতি আধুনিকদের ভাষায় 'কোরবাণী' সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখে তাতে তিনি যা বলেছিলেন, যতদূর মনে হয়, তার মর্ম এই যে ঃ কোরবানী বর্বর যুগের হত্যারীতির চিহ্ন বই তার কিচ্ছুই নয়; আল্লাহ দয়াময়, তিনি এ হত্যায় খুশী হতে পারেন না। এ প্রবন্ধ পড়ে নজরুল ইসলামের কলম গর্জে উঠলো। নব্য তুর্করা তখন স্বাধীনতার জন্য অকাতরে জান কোরবান করেছিলেন। সেই ব্যাপারে সাথে মিলিয়ে তিনি লিখেছেন ঃ

'ওরে হত্যা নয়, আজ সত্যাগ্রহ, শক্তির উদ্বোধন !
দুর্বর ভীরু চুপ রহে, অহো খামকা ক্ষুব্ধ মন !!
ধ্বনি ওঠে রণি, দূর-বাণীর
আজিকার এ খুন কোরবানীর।
দুম্বা-শির
রুম-বাসীর
শহীদের শির সেরা আজি—মহমান কি রুদ্র নন ?
ব্যাস, চুপ খামোশ রোদন।
এইদিন মীনা ময়দানে
পুত্র-স্নেহের গর্দনে
ছুরি হেনে খুন ক্ষরিয়ে সে।
রেখেছে আব্বা ইব্রাহীম সে আপনা রুদ্র পান;
ছি ছি, কেঁপো না ক্ষুদ্র মন।'

এই জোরের কথা, এই যে প্রচণ্ড শক্তির ভাষায় ইসলামের অনুষ্ঠানে সমর্থন, আধুনিক বাংলা ভাষায় এ নতুন। এ কবিতাটিও পড়তে পড়তে আমার মুখস্থ হয়ে গিছিলো। আমার 'কামাল পাশা' নাটকে তলোয়ারধারী তুর্ক বালকের মুখ দিয়ে আমি সমর-সঙ্গীতরূপে এই গান গাইয়েছি।

এলো তারপর 'খেয়াপারের তরুণী'। পড়লাম :

'কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা ;
দাঁড়ীমুখে সারি গান 'লা-শরীক আল্লাহ্ !'

আমি মুগ্ধ হলাম। যে পড়লো সে-ই মুগ্ধ হলো। ইসলামী শব্দকে বাংলা ভাষায় এমন চমৎকার রকমে হীরের টুকরোর মতো বসিয়ে দেওয়া যায়, এ যেন কারো ধারণাই ছিলো না।

নজরুলেব লেখায় এমনিভাবে বিস্ময়ের পর বিস্ময় দেখা দিয়ে তরুণ মুসলিম বাংলার মনকে মুগ্ধ করে ফেললো :

'নীল সিয়া আসমান লালে লালে দুনিয়া,
আম্মা লাল তৈরী খুন কিয়া খুনিয়া।'

এ উর্দু, না বাংলা ? আর এতো সুন্দর এ ! তারপর চললো—

'বাজিছে নাকাড়া, হাঁকে নকীবের তূর্য
হুঁসিয়ার ইসলাম, ডুবে তব সূর্য্য !'

অজ্ঞাতসারে পাঠকের কণ্ঠে উচ্চারিত হলো : মারহাবা নজরুল, মারহাবা !

'ওরম ফারুক,' 'খালেদ,' কামাল পাশা',—কবিতার স্রোত বয়ে চললো। খালেদের শেষ লাইন মনে আছে ; মনে থাকবে :

'খোদার হাবিব বলিয়া গেছেন : আসিবেন ঈশা ফের
চাই না মেহেদী, তুমি এসো বীর হাতে লয়ে শমশের !

কিন্তু কোন্‌টা ফেলে কোন্‌টার কথা বলবো ? এই যে তাঁর কবিতা, তাঁর গজল, তাঁর গান, তাঁর কাব্যময় বক্তৃতা, তাঁর সাম্যবাদ

তাঁর কারাবরণ—এ সমস্তই সে-আমলে মুসলিম যুবকদের মনে করেছিলো সুস্পষ্ট রেখাপাত। আমার মনের পাতাও যে তার ছায়া পড়েনি কেমন করে বলবো ?

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

…ছোটবেলা থেকেই নজরুলের ঝোঁক ছিল গানের দিকে। শিয়ারসোলের স্কুলের শিক্ষক সতীশ কাঞ্জিলাল মশাই ছাত্রের এই দিকে প্রবণতা লক্ষ্য ক'রে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তালিমও দিতেন। কাঞ্জিলাল মশাই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চর্চা করতেন! নজরুল যখন পল্টনে ছিলেন তখন পাশ্চাত্য সঙ্গীতের তামিল পেয়েছিলেন সহকর্মীদের কাছে। আর গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর থেকে ওস্তাদ জমীরুদ্দীন খাঁ সাহেবের কাছে নিয়মিত তালিম নিতে থাকেন। এক কথায় বলা যায় নজরুল সুরের সাগরে গা তাসিয়ে দিলেন। তাঁর রচিত গানের সংখ্যা তিন হাজারের চেয়ে কিছু বেশিই হবে। জমীরুদ্দীন খাঁ সাহেবের মৃত্যুর পর কবিকে তাঁর শূন্য আসনে গ্রামোফোন কোম্পানী সাদরে বসিয়েছিলেন—পদটি ছিল, 'ট্রেনার' ও হেড্ কম্পোজার'।

১৯৩০-এ নজরুল পুত্রশোক পেলেন, বৈশাখ মাসে তাঁর নয়নমণি বুলবুলের মৃত্যু হ'ল। ওইটুকু বয়সেই সে জমীরুদ্দীন খাঁ সাহেব এবং নজরুলের সঙ্গীত চর্চার মধ্যে থেকে নির্ভুল সুরে গান গাইতে শিখে ফেলেছিল। তার অকাল মৃত্যু পরিবারের উপর গভীর বিষাদের ছায়া ফেলল। নজরুলের আধ্যাত্মিক দিকে ঝুঁকে পড়ার কারণই সম্ভবতঃ বুলবুলের মৃত্যু। এর আগে শোক থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য তিনি হাসির গান লিখতে গিয়ে একা একা কেঁদেছেন, এত তাঁর বন্ধুদের কেউ কেউ দেখেছেন। আধ্যাত্মিক দিকে পা

ফেলার কারণই ছিল, বুলবুলকে চোখের দেখা দেখতে। সেই আশায় তিনি লালগোলা স্কুলের হেড্‌মাস্টার বরদাচরণ মজুমদারের কাছে যান নলিনীকান্ত সরকার মশাইকে সঙ্গে নিয়ে। সিদ্ধযোগী বলে মজুমদার মশাই-এর খ্যাতি ছিল—তবে তিনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন না, তিনি গৃহী যোগী। শোনা যায় যে বরদাচরণ নজরুলের এই কামনা চরিতার্থ করেছিলেন—নজরুলের চোখের সামনে বুলবুল এসে দাঁড়িয়েছিল। এর পর স্বভাবতই নজরুল মজুমদার মশাই-এর সঙ্গে হামেশা দেখা করতে লাগলেন। মজুমদার মশাই শ্মশানে গিয়ে কালী-সাধনা করতেন। তবে তিনি আত্মপ্রচারে-বিমুখ ছিলেন এবং সাধনক্ষেত্রে অন্য কাউকে টানা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। এবং তিনি অনধিকারীকে দূরে সরিয়ে রাখতেন। তাঁকে খুব কাছাকাছি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। সম্পর্কে আমি তাঁর ভাগিনেয়। কবি আধ্যাত্ম-সাধনমার্গে কতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন, তা বলার অধিকার আমার নেই, তবে এই পথে জোর করে পা দিতে গিয়ে বরদাচরণের মাসতুতো ভাই [নিবন্ধকারের আপন মামা] হরেন সান্যাল মশাই-এর সাময়িক মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটেছিল, এটা আমি ছেলেবেলায় দেখছি। হরেন মামা বরদাচরণের নিষেধ অগ্রাহ্য করে অমাবস্যার রাতের অন্ধকারে গোপনে দাদার পিছু পিছু শ্মশান অবধি গিয়েছিলেন—তারপর কী ঘটেছিল তা কেউ জানে না, তবে তিনি দু-হাত চোখের সামনে তুলে "রক্ত—রক্ত—রক্ত" আর্ত চিৎকারে সকলকে উচ্চকিত ক'রে বাড়ি ফিরছিলেন সে যা-ই হোক, নজরুল যে আধ্যাশক্তি সম্বন্ধে কৌতুহলী হয়েছিলেন এবং এর প্রভাব তাঁর বাস্তব জীবনকে অনেকখানি আচ্ছন্ন করেছিল এটুকু নির্ণয় করা যাচ্ছে।

১৯৪২-এর জুলাই মাসে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর প্রোগ্রামে অনুষ্ঠান করতে গিয়ে কবি টের পেলেন তাঁর জিহ্বা কাজ করছে না—কথা

বলতে গিয়ে গলা আটকে আসছে। তার আগে থেকেই তিনি নিজের অসুস্থতা বুঝতে পেরেছিলেন, তবে তেমন গ্রাহ্য করেননি। রেডিওর প্রোগ্রাম করা সম্ভব হ'ল না। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ঘোষণা করলেন—কবি অসুস্থ। এর পর নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ ট্যাক্সি ক'রে তাঁকে বাড়ি নিয়ে এলেন। এই সময়ে কবি দৈনিক নবযুগ-এর সম্পাদক ছিলেন। লুম্বিনী পার্কের হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসার পর মধুপুরে বায়ু পরিবর্তন এবং বিশ্রামের জন্য পাঠানো হ'ল।

অন্যের কাছে প্রকাশ পাওয়ার অনেক আগেই নজরুলের অসুখটা দেহে আত্মবিস্তার লাভ করেছিল। কাজেই যখন তাঁর চিকিৎসা শুরু হল তখন তা উপশমের বাইরে চলে গেছে। অন্যান্য দেশে কী হয় তা আমার জানা নেই, তবে আমাদের এদেশে শিল্পী, সাহিত্যিক শ্রেণীর মানুষদের ভাগ্যে যশ-খ্যাতি যতোই জুটুক, আর্থিক ক্ষেত্রে শতকরা নিরানব্বই-এরও বেশি জন তাঁরা উপেক্ষিত রয়ে যান—এটা অস্বীকার করা চলে না। নজরুলও তার ব্যতিক্রম নন। তাঁর প্রথম বই 'ব্যাথার দান' মাত্র দুশো (?) টাকার স্বত্ব বিক্রয় করতে হয়েছিল। হয়ত তখনকার দিনে দুশো অনেক টাকা। 'কপিরাইট' না বেচলে হয়ত তখন তাঁর অতি-বড় বন্ধুও গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য হাতে নিতেন না। তাঁর দ্বিতীয় কপিরাইট বিক্রেতা ঘটে ওই একই বছরে অর্থাৎ ১৯২১-এ এবার 'রিক্তের দান' এবং আরও দুটি বই মাত্র চার-শ টাকায় স্বত্ব বিক্রি করেন তিনি। 'অগ্নিবীনা' এবং 'যুগবাণী' প্রথম দিকে কপিরাইট বিক্রি করা হয় নি। যারা নজরুলের লেখার অনুরাগী তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ গ্রন্থ প্রকাশের সমস্ত ব্যয় বহন করলেও, সরকারী ঝামেলার ভয়ে প্রকাশক হিসেবে নিজের নাম ছাপাতে রাজী হন নি—আর্য পাবলিশিং হাউস থেকে যুগবাণী এবং অগ্নিবীণা প্রকাশক হিসেবে নজরুলের নামাঙ্কিত হয়েই বেরিয়েছিল। পরবর্তী কালে অবশ্য 'অগ্নিবীণার' কপিরাইট কেনেন ডি, এম লাইব্রেরী। ডি-এম লাইব্রেরী নজরুলের অধিকাংশ বই-ই প্রকাশ

করেছেন। গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তির আগে নজরুল-পরিবারের জীবনযাত্রা প্রধানতঃ তাঁর লেখার রয়্যালটির উপরেই নির্ভরশীল ছিল। তাঁর 'বিষের বাঁশী' এবং 'ভাঙার গান' সরকার থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। এই বাজেয়াপ্ত বইগুলি অনেকে গোপন কিনতেন এবং সেই বিক্রির টাকা নজরুল পরিবারের আর্থিক দুর্দিনে বেঁচে থাকতে সাহায্য করেছে। কেন না কোনো চাকুরিতেই তিনি স্থিরভাবে বেশীদিন টিকে থাকতেন না।

অনেকের ধারণা, নজরুলের আয় ছিল প্রচুর কিন্তু ব্যয়ে হাতখানা তাঁর এমন দরাজ যে, টাকা যেমন এসেছে তেমনি হাওয়ার আগে উড়ে গিয়েছে। এর খানিকটা অস্বীকার করা চলে না—বন্ধু বান্ধব খাইয়ে অথবা তাঁদের নিয়ে বেড়ানোর পিছনে তাঁর কম খরচ হয়নি। হিসেব করে চললে হয়ত স্ত্রী প্রমীলার অসুখের সময় 'এইচ-এম-ভি-র সমস্ত গানের রয়্যালটি বন্ধক রেখে তাঁকে চার হাজার টাকা ধারও করতে হত না। এমনি আরও অনেক অসুবিধের হাত থেকে নজরুল এবং তাঁর পরিবারে নিষ্কৃতি পেলেন হয়ত—কিন্তু তাতে নজরুল হয়তো কবি নজরুল হতে পারতেন না, কাজেই রয়ে যেতেন হয়ত নজরুল—নজরুল।

বেগম সুফিয়া কামাল

আমার জীবনে 'অগ্নিবীণা'র বিদ্রোহী কবি নজরুল এসেছিলেন অনাবিল আনন্দ-আলোকের মতো, তাঁর মমতা-মধুর স্নেহোজ্জ্বল দৃষ্টি আমার দিকে পড়েছিলো বলে আমি আজ সকলের কাছে পরিচিতা হতে পেরেছি। নয়তো সেই পরদানশীল খান্দানী ঘরের অন্তরাল হতে বাইরে আসার পথ আমি বুঝি পেতাম না।

ঢাকা থেকে তখন 'অভিযান' নামে একটি পত্রিকা বের হতো।

আমার ছোটোমামা নওয়াবজাদা সৈয়দ কজলে রব্বি সাহেব তখন ঢাকায় পড়তেন। তিনি জানতেন আমার বাল্যের লেখা-লেখা খেলার কথা। ছুটিতে বাড়ি গিয়ে আমার লেখা থেকে তিনি দু'তিনটি কবিতা নিয়ে আসেন। সে কবিতাগুলি 'অভিযানে' প্রকাশিত হয়। তখন নজরুল ঢাকায় মুকুটহীন সম্রাট ছাত্রমহলে তিনি প্রিয় হতে প্রিয়তম। আমার লেখা তাঁর চোখে পড়ে। হঠাৎ বরিশালে বসে আমি অচেনা হাতের লেখা একখানি চিঠি পাই। লেখকের নাম দেখে আমার তো চক্ষুস্থির। নজরুল ইসলাম। তারপর চিঠিতে আলাপ হয়ে গেলো। কবি হলেন আমার দাদু-ভাই। দাদুকে লিখে দিলাম কলকাতা যাচ্ছি। তিনি লিখলেন, এবারে নিশ্চয় দেখা হবে। হয়েও ছিলো। মাসিক পত্রিকায় তখন প্রথম প্রথম আমার লেখা বের হতে শুরু হয়েছে। দাদু এসেছেন এক পত্রিকা অফিসে, শুনে লোক পাঠালাম ; আমার চিঠি পেয়েই তিনি চলে এলেন। আমরা কখন সারেং লেন-এ থাকি। তখনও পর্দার বাঁধন যায়নি, একটু শিথিল হয়েছে মাত্র। আমি গিয়ে তাঁর কদমবুসি করলাম। কী আনন্দে যে তিনি আমাকে দেখে চীৎকার করে উঠলেন ; বললেন, 'তোমাকে আগে দেখিনি--তুমি এতটুকু। তোমাকে আমি লুফব্'। ঘরশুদ্ধ সবাই হেসে উঠলেন, দাদু অনর্গল আমাকে বলে চলেছেন, 'এতটুকু কেন, বেগম সাহেবা--আরে মিসেস-টিসেস হয়েছো, একটু ওজনে তো ভারি হবে, আগে জানলে একটা দোলনা আনতাম। আমি প্রথম এই একেবারে বহুইরের লোকের সামনে এসেছি যদিও,' তবুও তাঁকে পর বলে মনে হলো না, কোনো কুণ্ঠা বা লজ্জা বোধ করতে পারলাম না। তিনি কাছে বসিয়ে মাথায় হাত দিয়ে আদর ও দোয়া করলেন। আমি ধন্য হলাম।

এরপরে তিনি প্রায়ই আসতে লাগলেন। একদিন—তখন শীতের দিন, আমি ও আমার বড়ো ভাই সন্ধ্যার আগে বসে দাবা খেলছি। দড়াম করে দরজা খুলে একটা কম্বল গায়ে দাদু এসে

পড়লেন। দেখলেন, আমরা উঠে দাঁড়িয়েছি। ভাইয়াকে বললেন, 'দাবা খেলছিলে সুফিয়ার সাথে ?' ভাইয়া ও আমি বললুম, 'এই একটু একটু।' দাদু যেন একটু অবাক হয়ে বললেন, মেয়েরা দাবা খেলে! আমি তো দেখিনি। আমি খেলবো তোমার সাথে— নিয়ে এসো পান।' দাদু দাবা খেলবেন আমার সাথে—শুনেই তো আমার বুক শুকিয়ে গেছিলো—পান আনতে গিয়ে পালিয়ে বাঁচলাম! পান দিয়ে, চায়ের যোগাড় করে এসে দেখি, দাদু ও ভাইয়া দাবা পাত্‌ছেন। ভাইয়া খুব ভালো দাবা খেলতে পারেন। দাদু বললেন, 'তুমি ভাবছো তোমাকে ছেড়ে দেবো ? এক বাজী খেলে নিই, ততক্ষণ তোমরা নামাজ সেরে এসো, খেলতে হবে।' কিন্তু মগরের গেলো, এসে গেলো; পেয়ালার পর পেয়ালা চা, বাটার পর বাটা পান যুগিয়ে চললাম—বাজী আর শেষ হয় না।

রাত ১২টা বেজে গেলো; অতো রাত্রে কে আর ভাত খায়! রুটি গরম পরোটা তৈরী করে ভাইয়া ও দাদুকে মুখে তুলে খাইয়ে দিলাম; কিন্তু তাঁরা পরোটা-গোস্ত খেলেন, কি কাগজ খেলেন, বোঝা গেলো না। সারা রাত কেটে গেলো। পরদিন সকাল ৭টার সময় দেখি দাবার ছক উল্টে দিচ্ছেন আর হো-হো করে হেসে হেসে ভাইয়ার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে দাদু বলছেন, 'নাঃ, খেলে সুখ পাওয়া গেলো, জিততেও পারলাম না, হারলামও না, ড্র হয়ে গেলো —সত্যিই খেলতে জানো; আমাকে আর এতক্ষণ কেউ বসাতে পারেনি এক কাজী মোতাহার হোসেন ছাড়া।'—বলে আমার কৃশাঙ্গ ভাইয়ের হাতে যে ঝাঁকি দিলেন সেই আনন্দিত ঝাঁকুনির ব্যথা বেশ কয়েকদিন ছিলো।

দুপুর বেলায় খেতে খেতে দাদু বললেন, 'সুফু, তোমার রান্নার তারিফ করবো, না কবিতার তারিফ করবো ?'

আমি বললাম, 'দুটোরই।'

দাদু বললেন, 'তা না করলে তো মিথ্যে বলে কাজীর বিচারের

দুর্নাম হবে।'—বলেই বললেন, 'রাত্রে তুমি আমাদেরকে খাইয়ে দিয়েছিলে না?

আমি বললাম, 'তা কি তোমার মনে আছে?'

বললেন, 'মনে পড়েছে। তোমার মতো বোন যার নেই, সে সত্যিই দুর্ভাগা।'

আমাদের কাছে রোজ আসাটা পুলিশের চোখে পড়লো। তাঁরা দাদুর পিছু নিলেন। একদিন দাদু বসে আছেন—এক ভদ্রলোক এসে বসলেন। আমাদের কাছে আসেনি কবি, তাঁকে দেখতে পাড়ায় অনেক লোকই আসতো। দাদু তাঁকে দেখে বলে উঠলেন, 'তুমি টিকটিকি, জানি ঠিক ঠিকই'—আরো একটা লাইন কী বলেছিলেন আর আমার মনে নেই। লোকটি মুখ লাল করে উঠে চলে যেতেই আমি এসে বললাম, 'কী করে তুমি চিনলে দাদু?'

হেসে দাদু বললেন, 'গায়ের গন্ধে। বড়ো কুটুম্ব যে।' তাঁর এমনি হাজারো পরিহাসের খুঁটিনাটি আজও মনে পড়ে। হাসিতে খুশীতে আনন্দে উজ্জ্বল জীবন আজ কী হয়ে আছে, ভাবলে মনে ব্যথায় ভরে ওঠে।

ফররুখ আহ্‌মদ

ওহাবী আন্দোলনের ব্যর্থতা আমাদের জাতীয় জীবনে যে মারাত্মক নৈরাশ্য আর অবসাদের সৃষ্টি করেছিলো, ১৯০৫ সালের আগে তার ভিতর কোন পরিবর্তন দেখা যায় নি।

এই সুদীর্ঘ সময় একটানা ক্লান্তি ও হতাশার। অন্ধকার যবনিকা দীর্ণ করে কোন সূর্য্যের সাক্ষাৎই এ সময় পাওয়া যায়নি।

তবু জাতি পুরোপুরিভাবে মরেনি।

রাজনীতি আর অর্থনীতির ক্ষেত্রে চূড়ান্তভাবে অবহেলিত হয়েও শুধুমাত্র লৌকিক তমদ্দুনের জোরেই এ জাতি কোনো রকমে নিজের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রেখেছিলো। কিন্তু সেই বেঁচে থাকা মৃত্যুর নামান্তর না হলেও মুমূর্ষু প্রাণীর আত্মরক্ষার ক্লিষ্ট প্রয়াণ ছাড়া আর কিছুই নয়। তার নিজস্ব তাহ্‌জীব-তমদ্দুনের ক্ষীণ রেখা কোনো রকমে বাঁচিয়ে রেখেছিলো তার নিজস্ব অস্তিত্ব।

ইতিহাসের এই পটভূমি পিছনে রেখে বিচার করলে পরিস্থিতির গুরুত্ব আমরা সহজেই বুঝতে পারবো। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন এই অচলায়তনে প্রথম সাড়া জাগালো। আর আত্মবিস্মৃত জাতির জীবনে খিলাফৎ আন্দোলনই সর্বপ্রথম নিয়ে এলো দুকূল-প্লাবী বন্যা।'

খিলাফৎ আন্দোলন-কালে কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব একাধিক কারণে স্মরণীয়। আত্মবিস্মৃত জাতি বহুদিন পরে শুনলো তার আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা। নতুন করে পেলো সে তার ঐতিহ্যের পরিচয়।

স্বতন্ত্র তমদ্দুনের সে বৈপ্লবিক দাবীতে পাকিস্তান-আন্দোলন সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রগতিশীল বলে একদা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভি-নন্দিত হয়েছিলো তার গোড়াপত্তন হয় এ-সময় থেকেই।

বহু শতাব্দী ধরে বাঙালী মুসলমান আরবী-ফরাসী মিশ্রিত যে বাংলা জবান গড়ে তুলেছিল, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ষড়যন্ত্র যে-ভাষার কণ্ঠরোধ করেছিলো, কাজী নজরুলের বলিষ্ঠ লেখনীকে তার নতুন প্রকাশ দেখে উল্লাসিত হয়ে উঠলেন শিক্ষিত সমাজ। এমন কি, জনসাধারণের মধ্যেও এই সাড়া পৌঁছতে দেরী হলো না।

ইসলামের মরীমবাদ ও সুফীবাদ থেকে কাজী নজরুল যে উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন সেই ঐতিহ্যের প্রাণ-শক্তিই দেশের দুর্গত জনসাধারণকে বিপুল বেগে আকর্ষণ করলো মঞ্জিলের পথে।

'নীল সিয়া আসমান লালে লাল দুনিয়া
আম্মা ! লাল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া ।'

অথবা ঃ

'আবুবকর, উসমান, উমর, আলি হায়দর ।
দাঁড়ি যে এ তরণীর, নাই ওরে নাই ডর ।
কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি-মাল্লা,
দাড়ী-মুখে সারীগান—লা শরীক আল্লাহ্

কবির কাব্য যেমন আশ্বাসের বাণী বয়ে আনলো তেমনি সে উদ্বুদ্ধ করলো জাতিকে নতুন চেতনায় । এই সঙ্গে ইসলামের মানবতাবোধ সাম্য । ও সামাজিক ন্যায়-বিচার কবি-চিত্তে যে চেতনায় স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করলো তার কাহিনী খিলাফৎ আন্দোলনের একটি অধ্যায়কে যেমন জেহাদী ফরমান শুনিয়েছিলো ।

এই অগ্নি-গীতির সঙ্গে গজল ও কাব্য-গীতি মধুর রসে জনসাধারণের চিত্তে অভিসিঞ্চিত হয়েছে । কাজী নজরুল ইসলামের গীতোচ্ছ্বাস একটি অচেতন জাতিকে ফিরিয়ে দিয়েছে তার হারানো সম্বিৎ ।

বঙ্গ-ভঙ্গ, খিলাফৎ, অসহযোগ ও সন্ত্রাসবাদের পটভূমিতে যে কবি মানস গঠিত হয়েছিলো, তার অশান্ত মনের প্রতিচ্ছায়া দেখেছি আমরা তাঁর রচনায় । বাংলা সাহিত্যের একটা বিশেষ অধ্যায়ে রয়ে গেছে তাঁর দ্বন্দ্ব-মুখর মনের ছাপ !

কাজী মোতাহার হোসেন

সব কবিই তো মানুষের জন্য কাব্য লিখে থাকেন, তাহলে আর 'মানুষের কবি' বলে কবিকে বিশেষিত করবার তাৎপর্য কি ? প্রথমেই এ-কথাটা পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। আমরা সামাজিক কারণে মানুষকে নানা ভাগে ভাগ করে থাকি। যেমন হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ভারতীয়, পাকিস্তানী, ইংরাজ, ধনিক, বণিক, শ্রমিক, আশরাফ, আতরাফ, হানাফী, শাফেরী, হাম্বলী, রাজা, প্রজা, উজির, নাজির ইত্যাদি। কোনো কোনো কবি এইসব শ্রেণীর এক বা একাধিক বিশেষ শ্রেণীকে লক্ষ্য করে বা মনে-মনে প্রধান বলে গণ্য করে কাব্য লিখে থাকেন। এঁরা হচ্ছেন শ্রেণী বিশেষের কবি। আর যাঁরা শ্রেণী বিশেষকে প্রাধান্য না দিয়ে সকল মানুষের জন্য কাব্য লেখেন তাঁদের মানুষের কবি বলা যায়। নজরুল ইসলাম শ্রেণী প্রাধান্য স্বীকার করেননি। তিনি সকল মানুষের সমান অধিকার ও সম্ভাবনার দিকে জোর দিয়েছেন এবং মানুষের চিরন্তন আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, যৌবন-প্রেম, বীর-ধর্ম প্রভৃতি নিয়ে কবিতা লিখেছেন। এজন্য তাঁকে 'মানুষের কবি' বলে আখ্যাত করা হয়।

নজরুল ইসলাম জীবনে জাত বিচার মানেন নি। সাম্যের দিকেই তাঁর প্রধান আকর্ষণ। জাতের-বিচার ক্ষুদ্রতাকে বিদ্রূপ করে তিনি লিখেছেন :

> 'জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেলছো জুয়া।
> ছুঁলেই তোর জাত যাবে ? জাত ছেলের হাতের নয়তো মোয়া ॥
> হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি, ভাবলি এতেই জাতির প্রাণ।
> তাইতো বেকুব করলি তোরা এক জাতিকে একশো খান ॥'

ইসলামী শিক্ষার বিধান তিনি উদাত্ত সুরে ঘোষণা করেছেন :

> 'আমি ইসলামী ডঙ্কা গরজে ভরি জাহান—
> নাহি বড়ো ছোটো—সকল মানুষ এক সমান,

রাজা প্রজা নয় কারো কেহ।
কে আমীর তুমি নওয়াব বাদশা বালাখানায় ?
সকল কাজের কলঙ্ক তুমি, জাগালে হায়
ইসলামে তুলি সন্দেহ ॥'

এখানে যে-সব ভাগ্যবান সচরাচর নিজেদের বড়ত্ব' নিয়ে ছোটোদের ঘৃণা করে, তাদের বিরুদ্ধে কবির তিক্ত বাণী উচ্চারিত হয়েছে। প্রকৃত ইসলামী শিক্ষায় যে বড়ত্বের বড়াই নেই, কবি সেই বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন।

আবার যে-সব ভাগ্যবান বড়ো হয়েও বড়াই করে না তাঁদের প্রতি নজরুলের অপরিসীম শ্রদ্ধার নমুনা দেখুন ঃ

'মানুষেরে তুমি করেছো বন্ধু, বলিয়াছ ভাই, তাই
তোমারে এমন চোখের পানিতে তরি গো সর্বদাই।
বন্ধু গো প্রিয়, এ হাত তোমারে সেলাম করিতে গিয়া
উঠে না উর্ধ্বে, বক্ষে তোমারে ধরে শুধু জড়াইয়া'।

ওমর ফাবুকের মানব-প্রীতি কবিকে কী অপরূপভাবে মুগ্ধ করেছে এবং উপরের কবিতায় কী অপূর্বভাবে তা প্রকাশ হয়েছে। হৃদয়ের মাধুর্য দিয়ে নজরুল সব উঁচু-নীচু সমান করে দিতে চান। তাঁর ধর্মই হৃদয়ের প্রেম-ধর্ম, যে-প্রেম মানুষের কল্যাণে উৎসারিত হয়ে উঠে। তাই তিনি লিখেছেন ঃ

'তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব, সকল কালের জ্ঞান,
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা, খুলে দেব নিজ প্রাণ।
এই বন্দরে আরব দুলাল শুনিতেন আহ্বান,
এইখানে বসি' গাহিলেন তিনি কোরাণের সাম গান
মিথ্যা শুনি নি ভাই—
এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির কাবা নাই।'

মানব প্রেমের ক্ষেত্রে সমস্ত ধর্ম এসে হৃদয়-বন্দরে মিলিত হয়েছে —বিশ্ব সেখানে কোলাকুলি করে। এই হচ্ছে কবির বাণী এবং ইসলামের ধর্মের রূপ।

আমাদের দেশের একটি প্রধান দোষ হচ্ছে সামাজিক বা কুল-মর্যাদার মিথ্যা অহংকার। কবি এই ভেদাভেদ মিটিয়ে দিতে চান। তিনি 'যুগবাণী'তে লিখেছেন, 'সমাজ বা জন্ম লইয়া এই বিশ্রী উচু-নিচু ভাব তাহা আমাদিগকে জোর করিয়া ভাঙিয়া দিতে হইবে। আমরা মানুষকে বিচার করিব মনুষ্যত্বের দিক দিয়া, পুরুষকারের দিক দিয়া। এই বিশ্বমানবতার যুগে যিনি এমনি করিয়া দাঁড়াইতে পারিবেন তাঁহাকে আমরা বুক বাড়াইয়া দিতেছি।'

এখানে মনুষ্যতের অর্থ হচ্ছে, মানব-প্রীতি আর পুরুষকারের অর্থ বীর-ধর্ম নজরুলের মধ্যে আমরা একাধারে প্রেমের কোমলতা আর বীরত্বের দৃঢ়তার পরিচয় পাই। ইসলামের ভিতর কবি দেখেছেন এক বিশ্বব্যাপী আজাদীর আহ্বান। তাই তিনি বলেছেন ঃ

'অন্যেরে দাস করিতে কিংবা নিজে দাস হতে, ওরে
আসেনি ক' দুনিয়ার মুসলিম ভুলিলি কেমন করে ?
ভাঙিতে সকল কারাগার, সব বন্ধন লাজ
এলো যে কোরাণ, এলো যে ়ের নবী ভুলিনি সে-সব আজ ?

কোরাণের এই মুক্তিবাণী—তৌহিদের যা কর্মকথা সেই দিকে কবি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করেছেন। আমার মনে হয় অন্য কোনো কবিই তৌহিদের এই 'অবন্ধন রূপ' এত স্পষ্ট করে অনুভব করতে পারেননি। এইটি নজরুলের একটি বিশেষ দান। বন্ধন-লাজ-ভয় জয় করবার সাধনা যাঁরা করেছেন সেই বীরদের গান নজরুল গেছেন ঃ

'গাহি তাহাদের গান
বিশ্বের সাথে জীবনের পথে যারা আজি আগুয়ান।
সেদিন নিশীথ বেলা
দুস্তর পারাবারে যে যাত্রী একাকী ভাসালো ভেলা

প্রভাতে সে আর ফিরিল না কুলে। সেই দুরন্ত লাগি'
আঁখি মুছি আর রচি গান আমি আজিও নিশীথ জাগি'।
আজো বিনিদ্র গাহি গান আমি চেয়ে তারি পথ-পানে,
ফিরিল না প্রাতে যে জন সে-রাতে উড়িল আকাশ যানে,
নবজগতের দূর সন্ধানী অসীমের পথচারী,
যার ভয়ে জাগে সদা-সতর্ক মৃত্যু দুয়ারে দ্বারী।'

নজরুল বর্তমানকে যা পেয়েছেন তার থেকে এক উন্নততর নতুন বর্তমান গড়ে তুলবার প্রয়াসী। মানবতার কল্যাণ রথ সর্বদা সামনের দিকে চালাতে হবে, পিছে তাকিয়ে হা-হুতাশ করে কোনো লাভ নেই। তাই তিনি বলতে পেরেছেন :

'যাক্ রে তখ্‌ত তাউস, জাগ, রে বেহুঁশ
ডুবিল রে দেখ্ কতো পারস্য, রোম গ্রীক রুশ,
জাগিল তারা সকল, জেজে ওঠ হীনবল,
আমরা গড়িব নূতন করিয়া ধূলায় তাজমহল।

নজরুল আশার কবি—শুধু বৈষয়িক ক্ষেত্রে নয়, প্রেমের ক্ষেত্রেও! নজরুলের প্রেমিকা হচ্ছেন এক শাশ্বত প্রতীক্ষমানা অনন্ত-সুন্দরী। সর্বদা তার মিলনের জন্য কবি অগ্রসর হচ্ছেন, এক কূলে নৌকা না ভিড়লেও আর এক কূলে ভিড়তে পারে। সকল কূলই সেই এক প্রেমকবির। নজরুলের একটা গান আছে :

কেউ ভোলে না কেউ ভোলে অতীত দিনের স্মৃতি।
কেউ দুখ লয়ে কাঁদে কেউ ভুলিতে গায় গীতি॥
কেউ শীতল জলদে হের অশনির জ্বালা,
কেউ মুঞ্জরিয়া তোলে তার শুষ্ক বীথি॥
কেউ জ্বালে না আর আলো তার চির দুখের রাতে
কেউ দ্বার খুলি' জাগে চায় নব চাঁদের তিথি॥'

এখানে আশাবাদী নজরুলের মনের টান কোন দিকে তা সহজেই বোঝা যায়।

এই ভেদাভেদ চূর্ণকারী মানবতার কবিকে আমরা ভালোবাসি। কবি বহুবার বলেছেন, শ্রদ্ধা আমি অনেক পেয়েছি, কিন্তু ভালোবাসাই ভি

তাঁর আশ ধ্বনিত হয়েছে পূজারিণীর কয়েকটা লাইনে ঃ

'ভেবেছিনু বিশ্ব যারে পরে নাই, তুমি নেবে
তার ভার হেসে
বিশ্ব-বিদ্রোহীর তুমি করিবে শাসন অবহেলে।
শুধু ভালোবেসে।'

কবির এ-আশা পূর্ণ হয়েছে কিনা জানি না, কিন্তু তার অন্য যে-কোনো কবির চেয়ে মানুষের কবি নজরুলকে যে তার গুণে ভরা স্বদেশবাসী অনেক বেশী অন্তরঙ্গ বলে অনুভব করে থাকেন, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

গোপাল ভৌমিক

...নজরুল ইসলামের কবিপ্রতিভা বহুমুখী ও বিচিত্র পথগামী হলেও সে যুগে তরুণ সমাজের কাছে তাঁর সমধিক খ্যাতি ছিলো বিপ্লবী কবি বলে। আর তাঁর জীবনে এটা শুধু কথার কথা ছিল না এবং তিনি শুধু কাব্যরচনাতেই বিপ্লবী ছিলেন না—বিপ্লব ছিলো তাঁর ধমনীতে। তার মূল্যও তাঁকে জীবনে দিতে হয়েছে। সেজন্য অবশ্য তিনি অনুতাপ করেননি কিংবা সাময়িক লাভের লোভে স্বধর্মচ্যুত হন নি। তিনি গেয়েছেন ঃ 'বলো বীর। বলো উন্নত মম শির।' এ শুধু কবিতার কথা নয়—এ তার অন্তরের কথা এবং নিজের জীবনে তিনি বার-বার এই স্বাতন্ত্র্য বীরত্বের পরিচয় দিয়ে গেছেন। অনেক বাধার বিরুদ্ধে তিনি লড়াই করেছেন, খামখেয়াল ও দারিদ্র্য ছিলো তার নিত্য সঙ্গী। কিন্তু বেপরোয়া নজরুল ইসলাম সেজন্য কুণ্ঠিত

ছিলেন না এবং সেজন্য কোনদিন কারও কাছে তিনি নতি স্বীকার করেন নি।

এই একটি ক্ষেত্রে নজরুলের জীবন ও কাব্য এক। নিজের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং সেই সঙ্গে সমাজ ও মানুষের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা তার কবিতাগুলিকে নানা রঙে রাঙিয়ে তুলেছে। তিনি শুধু কবিই ছিলেন না—তিনি ছিলেন দেশসেবক ও সমাজ সংস্কারক। পরাধীন দেশের অসহ্য দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনা, আমাদের সমাজের নানা জাতীয় ভণ্ডামি ; ধর্মের নামে, রাজনীতির নামে নানা ধরণের শোষণ প্রয়াস নজরুল ইসলামের কবি-মনকে প্রায় ক্ষিপ্ত করে তুলেছিলো এবং তারই বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখতে পাই তার 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাশী,' 'ফণিমনসা,' 'সর্বহারা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের উদ্দীপনামূলক ঝাঁঝালো কবিতাগুলিতে! এগুলি নিছক কবিতা নয় এগুলি কবির জীবনের তাজা রক্ত দিয়ে লেখা। কবির ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়ঃ 'রক্ত ঝরাতে পারি না ত একা। তাই লিখে যাই এ রক্ত-লেখা।' কবির উক্তির মধ্যে আদৌ কোনো অতিরঞ্জন নেই। পূর্বেই বলেছি নজরুল শুধু কবিতার বিপ্লবী ছিলেন না, তিনি ছিলেন জীবনেও বিপ্লবী এবং এই বিপ্লবের উন্মাদনায় দেশমাতৃকার সেবা করতে গিয়ে দারিদ্র্যের অসহ্য যন্ত্রণা হাসিমুখে বরণ করে নিতে তিনি যেমন কুণ্ঠিত হন নি তেমনিই কারাবরণ করতেও কুণ্ঠিত হন নি। একাধারে বিপ্লবী সত্তা ও স্পর্শকাতর কবি-মনের অধিকারী নজরুল ইসলামকে তার কবিতাগুলির মধ্যে খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় না। তাঁর বহু কবিতায় বুদ্ধির চেয়ে হৃদয়াবেগের জোয়ার বেশি মানুষের ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি ছিলেন হৃদয়াবেগ প্রবণ মানুষ। মানুষের দুঃখ ও দারিদ্র্য দেখে মৌখিক সহানুভূতি জানিয়ে চুপ করে বসে থাকার লোক ছিলেন না—সে অবস্থার সম্মুখীন হলে দুঃখ দারিদ্র্য পীড়িত মানুষের অভাব মোচন করতে গিয়ে নিজের শেষ সম্বল পর্যন্ত তিনি অকাতরে দান করতেন।

কবিতা এবং গানই ছিলো প্রাণোচ্ছল নজরুল ইসলামের বলিষ্ঠ জীবনের একমাত্র সহায়। তিনি কবিতাকে নিপীড়িত জনগণের সংগ্রামে তাঁর হাতিয়ার করে তুলেছিলেন। এ কাজ ভালো হয়েছিলো কি খারাপ হয়েছিলো, তায় সূক্ষ্ম বিচার করবেন আজকের এবং ভাবী যুগের সাহিত্য সমালোচকগণ। আমি এখানে শুধু আমার উপলব্ধ একটি সত্যকে তুলে ধরেছি। একমাত্র বিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশে নয়, বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষেরও নজরুল ছিলেন একমাত্র জনগণের কবি এবং তারই ফলশ্রুতি স্বরূপ নিজের নাতীদীর্ঘ কবি-জীবনে জন-প্রিয়তার শীর্ষদেশে উঠেছিলেন তিনি। নিপীড়িত নির্য্যাতীত মানুষের কথা যেভাবে তাঁর কবিতায় ফুটে উঠেছে, ইদানীংকালের আর কোনো কবির কবিতায় তার পরিচয় আমরা পাই না। যতদিন পৃথিবীতে দারিদ্র্য-দুঃখ থাকবে, নিপীড়ন-নির্য্যাতন থাকবে এবং সামাজিক বৈষম্য, অনাচার প্রভৃতি থাকবে, ততদিন নজরুল ইসলামের এই সব কবিতার আবেদনও কমবে না—এই আমার বিশ্বাস।

রমা চৌধুরী

…দেশের গৌরব, পরম শ্রদ্ধেয় কাজী নজরুল ইসলাম প্রকৃতপক্ষে সাধক। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের পুণ্যশ্লোক সাধকদের মতই তিনিও জগতের ও জীবনের অন্তর্নিহিত সত্যকে উপলব্ধি করার সাধনায় জীবন উৎসর্গ করে ধন্য হয়েছিলেন।

তাঁর ধর্ম দর্শনমূলক কাব্যকৃতির প্রতি পংক্তিতে পংক্তিতে এই সত্যটি প্রকটিত হয়ে রয়েছে মধুরতম মহিমায়। কী স্থির বিশ্বাসভরে কী ধীর আনন্দ উচ্ছ্বসিত অন্তরেই না তিনি বারংবার বলেছেন গভীর ভাবাবেগের সঙ্গে ঃ

(মা)　একলা ঘরে ডাকবো না আর
　　দুয়ার বন্ধ করে।
(তুই)　সকল ছেলের মা যেখানে
　　ডাকবো মা সেই ঘরে।

কিংবা

আয় অশুচি আয়রে পতিত,
　　এবার মায়ের পূজা হবে।
যেথা সকল জাতির সকল মানুষ
　　নির্ভয়ে মা'র চরণ ছোঁবে॥

*　　*　　*

(মা)　সিংহ-আসন হতে নেমে
　　বসেছে দেখ্ ধুলির তলে।
(মা'র) মঙ্গলঘট পূর্ণ হবে
　　সবার ছোঁওয়া তীর্থজলে।

*　　*　　*

দীনের হতে দীন অধম যথা থাকে
ভিখারিণী বেশে সেথা দেখেছি।
　　মোর মাকে।
(মোর) অন্নপূর্ণা মাকে॥
অহঙ্কারের প্রদীপ নিয়ে স্বর্গে
　　মাকে খুঁজি,
(মা) ফেরেন ধুলিব পথে
　　যখন ঘটা করে পূজি॥

কী অপূর্ব এই সর্বজনীন উদার ভাব। এই তো হলো প্রকৃত ভারতীয় ভাবধারায় অনুসরণ,—ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ব্রহ্মকে, জীবের মধ্যে শিবকে উপলব্ধি করা, আরাধনা করা, সেবা করা।

কিন্তু কাজী নজরুল কেবল সাধারণভাবে ভারতীয়ই ছিলেন না, ছিলেন সেই সঙ্গে বিশেষভাবে বাংলার ভাবসাধনার উত্তরসাধক। বাঙালীর ধর্ম ও জীবনবোধের বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁর মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিলো। বাঙালীর এই বৈশিষ্ট্যের অন্যতম হলো জগজ্জননীকে অতি অনায়াসেই—'ঘরের দেখা, ঘরের মা'-রূপে পাওয়া, গৌণ অর্থে নয়, রূপক অর্থে নয়, জ্ঞানের দম্ভে বা নিছক কবির কল্পনাতেও নয়—মুখ্য ও আক্ষরিক অর্থেই সেই পাওয়া সত্য ও বাস্তব। জগজ্জননীকে নিজের মায়ের মতো একান্তভাবে পাবার আকুতিই চিরকাল বাংলার কবি ও সাধকদের অনুপ্রাণিত করেছে। বস্তুত এই মাই ছিলেন নজরুলের আধ্যাত্ম-সাধনাপুত জীবনের সর্বস্ব তাঁর—অন্য সব কামনা বিলীন হয়ে গিয়েছিলো মায়ের জন্য তাঁর আকুল আকুতির মধ্যে। এই ছিলো তাঁর শ্রেষ্ঠ সাধনা।

মঈনুদ্দিন

'কাঠবিড়ালী! কাঠবিড়ালী! পেয়ারা তুমি খাও?
গুড়-মুড়ি খাও? দুধ-ভাত খাও? বাতাবী নেবু? লাউ?
বেড়ালবাচ্চা? কুকুরছানা? তাও?

ছোট্ট শিশুদের মনের মতো এই সুন্দর কবিতাটি লিখেছেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম। এরূপ আরো কতো কবিতা যে তিনি লিখেছেন, তার লেখা-জোখা নেই। তিনি কবিতা লিখেছেন, গান লিখেছেন, গল্প লিখেছেন: শুধু ছোটদের জন্যই যে তিনি লিখেছেন, তা নয়। বড়োদের জন্যও তিনি অনেক কিছু লিখেছেন আর সে লেখায় এমন জোরে যে, কথায়-কথায় আগুন ছোটে। মানুষের মনের কথা যেন তিনি টেনে বের করে কাগজের বুকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এজন্যই সকল মানুষ তাঁকে সমানে ভালোবাসে।

তের শ ছ সালের এগারোই জ্যৈষ্ঠ নজরুল ইসলাম পৃথিবীর মাটিতে প্রথম পা রাখেন। তাঁর বাবার নাম কাজী ফকির আহম্মদ। আর মায়ের নাম জাহেদা খাতুন। বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে তাঁরা বাস করতেন।

ফকির আহম্মদ সাহেব ছিলেন খুব মুসুল্লী মানুষ। হরদম তিনি নামাজ-রোজা আর তস্‌বীহ্‌-তেলাওয়াৎ নিয়ে মশগুল থাকতেন। তাঁদের বাড়ীর কাছেই ছিলো 'পীর-পুকুর' নামে এক মস্ত দিঘি। তার পাড়ে হাজী পাহ্‌লোয়ান নামে এক পীর সাহেবের মজার শরীফ তার একটি মসজিদ। এই মজার আর মসজিদের খেদমত করেই ফকির আহম্মদ সাহেব সারাদিন কাটিয়ে নিতেন।

নজরুল ইসলাম ছোটবেলায় ছিলেন খুব দুষ্ট। তাঁর দুষ্টুমীর জ্বালায় গাঁয়ের সবাই যেন ভয়ে কাঁপতো। কতো রকমের দুষ্টুমীই যে তাঁর মাথায় খেলতো, যা আল্লাহ্‌ই জানেন। পাখীর ছানা পাড়া থেকে আরম্ভ করে মানুষের পাকা ধানে মই দেওয়া পর্যন্ত কোনো দুষ্টুমিতেই পিছ্‌পা ছিলেন না। বাবার কড়া শাসনের ফাঁকে ফাঁকে তাঁর দুষ্টুমীর গতি মাঝে-মাঝে মাত্রা ছাড়িয়ে যেতো। গ্রামের দুষ্টু ছেলেদের তিনি ছিলেন সর্দার।

তাঁর বাবা তাকে গ্রামের মক্তবে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। তিনি সেখানে কিছু-কিছু কার্‌সী আর কুরআন শরীফ পড়েছিলেন। দুষ্টু ছেলের একটা মজা এই যে, দুষ্টুমিতেও তারা যেমন ওস্তাদ আবার পড়াশুনায়ও তারা হয় সব চাইতে ভালো। নজরুল ইসলামের বেলায়ও এই কথাটি সত্য। দশ বৎসর বয়সে যখন তিনি মক্তবের পড়া শেষ করলেন, তখন দেখা গেলো, তিনি যেটুকু শিখেছেন, তার মধ্যে কোনো গলদ নেই। কোন ফাঁকি নেই। এই বয়সেই তিনি উর্দু আর ফারসী এমন সুন্দরভাবে উচ্চারণ করতেন যে, তা শুনে সবার তাক্‌ লেগে যেতো। তাঁর খোশ্‌ এলহানে কুরআন শরীফ

তেলাওয়াৎ শুনে বড়ো-বড়ো মৌলবী-মওলান সাহেবান্ খুশিতে তার পিঠ চাপড়াতেন।

মক্তবের পড়া শেষ করলেন তিনি দশ বৎসর বয়সে। এই সময়ে তাঁর পড়াও গেলো বন্ধ হয়ে। কারণ, তাঁর বাবা মারা গেলেন। তাঁর দুঃখিনী মা ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে অকুল সাগরে ভাসলেন। গরীবের সংসার খেতেই কুলোয় না, তাঁকে পড়াবে কে। এক বছর পর্যন্ত নজরুল ইসলাম ঐ মক্তবেই শিক্ষাকতা করলেন। এই সময় তিনি গ্রামে মোল্লাকীও করতেন। আর মসজিদে ইমামতীও করতেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা তাঁর অশান্ত মন কিছুতেই মেনে নিতে পারলে না। অভিভাবকহীন নজরুল লাগাম-ছেঁড়া ঘোড়ার মতো যেদিকে ইচ্ছা ছুটে যেতে লাগলেন ; কিন্তু এই অল্প বয়সে দিশেহারা হয়ে কোথায় যাবেন !

তাঁর এক চাচার নাম কাজী বজলে করীম। তিনি ফরাসীতেও ভালো কবিতা লিখতে পারতেন। তাঁর ছায়া নজরুলের জীবনে পড়েছিলো। তিনি ছোট বয়সেই নানা রকমের ফরাসী-বাঙ্‌লা মেশানো কবিতা লিখতে চেষ্টা করতেন। মাঝে-মাঝে দু'একটা কবিতা বেশ ভালো হয়ে যেতো। পাশের গ্রামে 'লেটো' গানের একটা দল ছিলো। তারা যাত্রা গানের মতো এক রকম পালা-গান করতো। মাঝে মাঝে নজরুল তাদের জন্য পালা গান লিখে দিতেন। এতে তাঁর দু পয়সা রোজগার হতো। এই অল্প বয়সেই তিনি পালা গান লিখে বেশ শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। তার গানের আদরও খুব বেড়ে গিয়েছিলো। কিন্তু তাঁর মনে ছিল আগুনের কুণ্ড। তিনি গ্রামের ঐ ছোট্ট জায়গায় আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। একদিন গ্রাম থেকে পালিয়ে তিনি আসানসোল চলে গেলেন। পালিয়ে তো গেলেন, কিন্তু যান কোথায়। পেট বড়ো দারুণ জিনিস। একদিন তার আহার না যোগালেই চোখে আঁধার দেখতে

হয়। তাই তিনি 'পাঁচ টাকা মাইনের ময়দা-মাখার কাজ নিলেন ওখানেই একটি রুটির দোকানে।

মজলিশী লোক—যেখানে যান, সেখানেই তাঁর মজলিশ জমে ওঠে। তিনি দিনের বেলা ময়দা মাখেন আর রাত্রে অবসর সময় সুর করে পুঁথি পড়েন, গাম গেয়ে সকলকে মাতিয়ে তোলেন, বাজনা বাজিয়ে পাড়া তোলপাড় করেন। এই সকল কারণে অনেকেরই নজর তাঁর উপর পড়লো।

আসানসোলে কাজী রফিউদ্দীন নামে একজন পুলিস সাব ইন্সপেক্টর ছিলেন। তিনি নজরুলের গুণের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হলেন। ভাবলেনঃ একে লেখাপড়া শেখাতে পারলে কালে হয়তো এ খুব বড়ো কাজ করতে পারবে। তিনি নজরুলকে নিজের দেশে নিয়ে এলেন। তাঁর বাড়ী ছিলো মনমনসিংহ জেলার কাজিরশিমলা গ্রামে। এর কাছেই দরিরামপুর হাইস্কুল। সেখানে তিনি নজরুলকে ভর্তি করে দিলেন। এই স্কুলে নজরুল মাত্র এক বৎসর পড়লেন। তারপর সেখানের হেডমাস্টার বদলী হয়ে যাওয়ায় নজরুলের মন ওখানে টিক্‌লো না, তিনি রাণীগঞ্জে গিয়ে সিয়ারসোল হাইস্কুলে ভর্তি হলেন। হাই স্কুলে ভর্তি তো হলেন। কিন্তু তাঁর অশান্ত মন স্কুলের বাঁধাবার নিয়মের সাথে কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারলো না। তিনি স্কুলের বই ছেড়ে বাইরের বই পড়েন, পরীক্ষার খাতায় কবিতা লিখে নিজের শক্তির পরিচয় দেন। এমনিভাবে হ-য-ব-র-ল আর গোল-মালের মধ্যে তিনি ক্লাশ টেন পর্যন্ত উঠলেন।

তখন পৃথিবীতে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। দলে-দলে লোক পল্টনে ভর্তি হয়ে লড়াইয়ে যাচ্ছে। নজরুলও বাঙালী পল্টন-এ নামে লিখিয়ে একদিন করাচী চলে গেলেন।

নজরুলের ভিতর আল্লাহর দেওয়া শক্তি ছিলো অসীম। তাই ছেলেবেলায় যখন তিনি দুষ্টুমা করতেন, যখন ছিলেন দুষ্টু দলের

সর্দাব মোল্লাকী করার সময় তিনি হয়েছিলেন মসজিদের ইমাম। আর পল্টনে যোগ দিয়েও তিনি কি ক্ষুদে পল্টন হয়ে থাকতে পারেন? সেখানেও সকল পল্টনের উপরে হাবিলদার হয়ে সকলের মাথার মণি হয়ে রইলেন।

পল্টনের দলে একজন ফার্‌সী জানা মৌলবী ছিলেন। তাঁর সাহায্যে তিনি ভালো-ভালো ফার্‌সী কবিতার বই, বিশেষ করে হাফিজের বইগুলি পড়ে নিলেন। আর বাংলা ভাষায় দিতে লাগলেন তারই রূপ।

বাংলা ভাষায় এর আগে যে-সব গল্প, কবিতা ইত্যাদি লেখা হতো, নজরুলের লেখা হতে লাগলো তার চেয়ে অন্য ধরনের। তাঁর ভাষা নতুন, বলার ভঙ্গী নতুন বাংলা দেশের সবাই এই নতুন লেখার সাথে পরিচিত হয়ে চম্‌কে উঠলো।

তারপর নজরুল লড়াই থেকে ফিরে এসে তাঁর লেখার মারফৎ সারা দেশে যে আগুন ছড়ালেন, তাতে যুবকের দল পাগল হয়ে উঠলো, বৃদ্ধেরা কুঁজো পিঠে সোজা করে জোরে-জোরে পা ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে চললেন। সারা দেশ নবজীবনের পথে পা বাড়ালো।

সৈয়দ মুজতবা আলি

পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, রাজমহল, শ্রীরামপুর, হুগলী এবং পরবর্তী যুগে কলকাতায় অনেকখানি আরবী-ফার্সীর চর্চা হয়েছিলে বটে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে এ চর্চা খুব ছড়িয়ে-পড়তে পারেনি। তার প্রধান কারণ অতি সরল—ইসলাম পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে পূর্ব বাংলার মতো ছড়িয়ে পড়তে পারেনি, কাজেই অতি সহজেই অনুমান

করা হায়, চুরুলিয়া অঞ্চলে পীর দরবেশের কিঞ্চিৎ সমাগম হয়ে থাকলেও মৌলবী-মৌলানারা সেখানে আরবী-ফার্সীর বড়ো কেন্দ্র স্থাপন করতে পারেননি।

তদুপরি নজরুল ইসলাম ইস্কুলে···খুব বেশী আরবী-ফার্সী চর্চা করেছিলেন তা মনে হয় না। ইস্কুলে তিনি আদৌ ফার্সী (আরবীর সম্ভাবনা নগণ্য (অধ্যয়ন করেছিলেন কি-না, সে সম্বন্ধেও আমরা বিশেষ কিছু জানিনে।

তারো পরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেওয়ার ফলে তিনি যে এ সব ভাষাও খুব বেশী এগিয়ে গিয়েছিলেন তাও তো মনে হয় না। তবু নজরুল ইসলাম মুসলিম ভদ্রঘরের সন্তান! ছেলেবেলায় নিশ্চয়ই কিঞ্চিৎ আলিফ, বে, তে করেছেন। দোয়া-দরুদ (মন্ত্র-তন্ত্র) মুখস্থ করেছেন, কুরান পড়াটা রপ্ত করেছেন। পরবর্তী যুগে তিনি কুরানের শেষ অনুচ্ছেদ 'আমপারা' বাংলা ছন্দে অনুবাদ করেন—হালে সেটি প্রকাশিত হয়েছে। সে পুস্তিকাতে তাঁর গভীর আরবী জ্ঞান ধরা পড়ে না—ধরা পড়ে তাঁর কবিজনোচিত অন্তদৃষ্টি এবং 'আমপারা'র সঙ্গে তাঁর আবাল্য পরিচয়। বিশেষ করে ধরা পড়ে, দরদ দিয়ে সৃষ্টিকর্তার বাণী (আল্লার 'কালাম') হৃদয়ঙ্গম করার তীক্ষ্ণ এবং সূক্ষ্ম প্রচেষ্টা :

এরই উপর আমি বিশেষ করে জোর দিতে চাই। ফার্সী তিনি বহু মোল্লা-মৌলবীর চেয়ে কম জানতেন, কিন্তু ফার্সি কাব্যের রসাস্বাদন তিনি করেছেন তাঁদের চেয়ে অনেক বেশী।

কাজী রোমান্টিক কবি। বাংলা দেশের জল-বাতাস, বাঁশ-ঘাস যে রকম তাঁকে বাস্তব থেকে বহুলোকে নিয়ে যেতো, ঠিক তেমনি ইরান তুরানের স্বপ্নভূমিকে তিনি বাস্তবে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন বাংলা কাব্য। ইরানে তিনি কখনো যাননি, সুযোগ পেলেই যে যেতেন, সে-কথাও নিঃসংশয়ে বলা যায় না, কিন্তু ইরানের

গুল বুলবুল পিরাজী-সাকী তাঁর চতুর্দিক ক্রমশই এমন এক জানা-অজানার ভুবন সৃষ্টি করে রেখেছিলো যে, গাইড-বুক টাইম-টেবিল ছাড়াও তিনি তার সর্বত্র অনায়াসে বিচরণ করতে পারতেন।

আরব ভূমির সঙ্গে কাজী সাহেবের যেটুকু পরিচয়, সেটুকু প্রধানতঃ ইরানের মারফতেই। কুরান শরীফের হারানো ইউসুফের যে করুণ কাহিনী বহু মুসলীম-অমুসলীমের চোখের জল টেনে এনেছে তিনি কবিরূপে তার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন ফার্সী কাব্যের মারফতে!

দুঃখ করো না, হারালো য়ুসুফ
কাননে আবার আসিব ফিরে।
দলিত শুষ্ক এ-মরু পুনঃ
হয়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে॥
ইউসুফে গুম্‌গশ্‌তে বা'জ আয়দ র্‌কিনান্‌
গম্‌ ম্‌ খুব!
কুল্‌বয়ে ইহ্‌জান শওদ্‌ রূজি গুলিস্তান্‌
গম্‌ ম্‌ খুর॥

কাজী সাহেবের প্রথম যৌবনের রচনা এই ফার্সী কবিতাটির বাংলা অনুবাদ অনেকেরই মনে থাকতে পারে। 'মেবার পাহাড়, মেবার পাহাড় এর অনুকরনে 'শাত্তিল আরব, শাত্তিল আরব ঐ যুগেরই অনুবাদ।

কোন কোন মুসলমান তখন মনে মনে উল্লসিত হয়েছেন এই ভেবে যে, কাজী 'বিদ্রোহী লিখুন আর যাই করুন, ভিতরে ভিতরে তিনি খাঁটি মুসলমান। কোনো কোনো হিন্দুর মনেও ভয় হয়েছিলো (যাঁরা তাকে অন্তরঙ্গভাবে চিনতেন তাদের কথা হচ্ছে না) যে, কাজীর হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতি বোধ হয় বাংলার জন্য নয়—তাঁর দরদ বুঝি ইরান তুরানের জন্য। পরবর্তী যুগে- পরবর্তী যুগে কেন ঐ সময়েই, কবিকে যাঁরা ভালো করে চিনতেন, তারাই

জানতেন ইরানী সাকীর গলায় কবি যে বার বার শিউলীর মালা পরিয়ে দিচ্ছেন তার কারণ যে সুন্দরী ইরানের বিদ্রোহী কবিদের নর্ম সহচরী ব'লে—ইরানের বিদ্রোহী আত্মা কাব্যরূপে, মধুররূপে তার চরম প্রকাশ পেয়েছে সাকীর কল্পনায়।

প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়

১৯২৩ সালে বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের এক বৎসর সশ্রম কারাবাস হয়। ঐ সময় রাজনৈতিক কয়েদীদের কোনো শ্রেণী বিভাগের নিয়ম ছিলো না। যাকে পারতো তাকেই ধরে নিয়ে এসে বন্দী করতো। পরে বিচারক প্রহসনের দ্বারা দণ্ড দিয়ে কয়েদীর ছাপ দিয়ে দিতো। বিচারক সুইন হো নিজে কবি হয়েও বিদ্রোহী কবির বেলাতেও কোনো শ্রেণী বিভাগ না করেই তাঁকে সাধারণ কয়েদীরূপে গণ্য করেছিলো। ডোরাকাটা হাফ্ পাঞ্জাবী, উক্ত কাপড়ের ইজের আর ঐ কাপড়েরই গামছার মতো গা মোছা চাদর, বিষম কুটকুটে খোঁচা খোঁচা লোমের কম্বল সহ এই অপরূপ পোষাকে জেল কর্তৃপক্ষ বাংলার জাতীয় জাগরণের কবিকে সাজিয়ে কয়েদীর গদিতে ছেড়ে দিলো।

কবি কলকাতা জেল থেকে হুগলী জেলায় এলেন। কবিকে আনা হয়েছিলো কোমরে দড়ি বেঁধে। জেলখানায় ঢুকেই উদাত্ত স্বরে 'দে গরুর গা ধুইয়ে বলে হাঁক ছাড়লেন। রাজনৈতিক বন্দীরা সচকিত হয়ে শুনলো, বিদ্রোহী কবি নজরুল হুগলী জেলে পদার্পন করেছেন। সকলেই কবির আগমনে বন্দীদশার একঘেয়েমিতে বৈচিত্র্যের আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠলো।

বিভিন্ন জেলার অহিংস, বিপ্লবী যুব ও ছাত্রসমাজ বিশেষ করে হুগলীর যুব ও ছাত্রসমাজের একটা বড়ো অংশ তখন আন্দোলনের সৈনিকরূপে 'হুগলী বিদ্যামন্দিরে' স্বেচ্ছাসেবকরূপে সমবেত হয়েছিলো। হুগলী জেল তখন বিভিন্ন জায়গায় রাজনৈতিক বন্দীর সমাগমে গম্‌গম্‌ করেছিলো। কবি নজরুলকে পেয়ে বন্দীরা গানে, আবৃত্তিতে, হাসির হুল্লোড়ে খুব হৈ-চৈ করে কাটাতো। বাইরে থেকে ছাত্রের দল হুগলী ব্রীজের উপর উঠে জেলের কয়েদীদের দেখতো এবং নানারকমে উৎসাহিত করতো ঃ বিপ্লবী তরুণ নেতা সিরাজুল হক্ তাঁদের দল নিয়ে হুগলী ব্রীজের উপর থেকে তাক বুঝে কাপড় গামছা, তোয়ালে সাবান, বিড়ি-সিগারেট, খবরের কাগজ প্রভৃতি ছুঁড়ে-ছুঁড়ে দিতেন। কবি সুবোধ রায়, সিরাজুল হক, হামিদুল হক, জনার্দন প্রভৃতি এই সব কাজের নতুন-নতুন উপায় উদ্ভাবন করতেন। কারণ এ ব্যাপারটা যাতে করতে না পারে তার জন্য জেল কর্তৃপক্ষ নানারূপ বাধার সৃষ্টি করতো। বন্দীরাও তাঁদের খবরাখবর পাঠাবার জন্য চিঠি প্রভৃতি ঢিলের সঙ্গে জড়িয়ে ছুঁড়ে এদিকে পাচার করতেন। তাই জেল কর্তৃপক্ষ যখন প্রায় হার মানলো তখন সাদা পোষাকে পুলিশের আড়কাঠি নিযুক্ত করতে বাধ্য হলো, কারণ জেলের অনেক গুপ্ত তথ্য প্রকাশ হয়ে যাচ্ছিলো। এইভাবে বাইরের লোকের সঙ্গে বন্দীদের যোগাযোগ যখন ঘনীভূত হয়ে উঠেছে, বাধা দেবার শত চেষ্টাতেও কাজটি সমানেই চলেছে, বাধ্য হয়ে কর্তৃপক্ষ তখন ব্রীজের উপরের বন্দুকধারী পুলিস পাহারার ব্যবস্থা করলো! কিন্তু দুঃসাহসী ছেলেদের এতেও ঠেকানো গেলো না। সেজন্য ব্রীজের দক্ষিণ-দিকের অনেকটা জায়গা ঢেউ টিন দিয়ে খুব উঁচু করে বেড়া দিয়ে ঢেকে দিলো। তবুও দুর্দান্ত কয়েকটি ছেলে জীবন বিপন্ন করে চেষ্টা করে, কিন্তু বিদ্যামন্দিরের নেতাদের নিষেধে তারা হাত গুটিয়ে নিলো। যতগুলো জেল আছে তার মধ্যে হুগলী জেলটা সবচেয়ে ওঁচা। এর জেলর যেমি অভদ্র তেমনি অশিক্ষিত ছিল। চোর ডাকাত,

পকেটমারদের সঙ্গে যে ব্যবহার করতো, বিশিষ্ট ও সম্মানিত রাজ নৈতিক বন্দীদের সঙ্গেও সে লোকটা সেই ব্যবহার করতো। চিঠি লেখার কাগজ, খবরের কাগজ তো দিতই না, কলম পেন্সিল অফিসে জমা নিয়ে নিতো তারা জোর করে। এই ব্যাপারে কবি নজরুলের মনটা অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলো। এই সময় হুগলী জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন এক ইংরেজ। নাম তার 'আর্সটন'।

রাজনৈতিক বন্দীদের দেখলেই কারণে অকারণে সে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠতো। বন্দীরাও মজা দেখবার জন্য তাকে চটাবার আয়োজন করে রাখতো। কবি নজরুল এই ইংরেজ জেল সুপারটির নাম রেখেছিলেন হর্সটোন (Horsetone) মানে পিচেশ-কণ্ঠি। কবি একে চটাবার জন্য 'সুপার-বন্দনা, নামে একটি গান লেখেন। গানটি এই ঃ

'তোমারি জেলে পালিছ ঠেলে
তুমি ধনা ধন্য হে।
আমারি গান তোমারি ধ্যান
তুমি ধন্য ধন্য হে।
রেখেছো সান্ত্রী পাহারা দোরে
আঁধার কক্ষে জামাই আদরে
বেঁধেছো শিকল প্রণয় ডোরে
তুমি ধন্য ধন্য হে।
আকাড়া চালের অন্ন লবণ
করছো আমার রসনা লোভন
বুড়ো ডাঁটা 'লপসী' শোভন
তুমি ধন্য ধন্য হে।
ধরো ধরো খুড়ো চপেটা মুষ্টি
খেয়ে গয়া পাবে সোজা সন্তুষ্টি,
ওল-ছোলা দেহ ধবল কুষ্ঠ
তুমি ধন্য ধন্য হে॥

কবি রবীন্দ্রনাথের 'তোমারি গেহে পালিছো স্নেহে' গানটির হ্যালিক অর্থাৎ প্যারডি। 'বুড়ো ডাঁটা' কথাটির একটা ব্যাপার আছে তা এই যে, হুগলী জেলে কি সাধারণ কয়েদী কি রাজনৈতিক কয়েদীদের দিয়ে খুব বড়ো করে একটা তরকারীর বাগান করা হয়েছিলো, শুনেছি এখনও হয় (বোধহয় রাজনৈতিক কয়েদীদের আর খাটতে হয় না) কিন্তু তখনকার দিনে ভালো-ভালো তরকারী, ভালো ভালো ফুলের থোকাগুলো জেল কর্তৃপক্ষের ঘরে চলে যেতো ; আর বুড়ো ডাঁটা, কপির শুকনো পাতা, ফুটে যাওয়া ফুলকপি, দরকচা-ধরা বেগুন, ঝিঙে, আধপচা লাউ, কুমড়ো আর তরকারীর খোসা প্রভৃতিতে কয়েদীদের রসনা তৃপ্তির ব্যবস্থা হতো। সপ্তাহে একদিন মাছ, একদিন মাংসের বরাদ্দের মধ্যে কাঁটা ও হাড় দেখা যেতো, বাকী বস্তুর গতি যে কী হতো তা কয়েদীরা সবাই বুঝতো। আর তরকারীর খোসা খুদ্র ও ধানের 'কুন' মিশিয়ে সেদ্ধ করে ভোরের দিকে সান্‌কি থেকে সান্‌কিতে ঢেলে দিয়ে যেতো ফালতুরা, তার রং ছিলো কালো, আস্বাদের তো কোনো বালাই ছিলো না। জেল জীবনে হুগলীর কয়েদীদের ঐটাই ছিলো পরম পদার্থ 'লপ্‌সী'। কবি নজরুল ঐ অ-পদার্থকেই 'বুড়ো ডাঁটা ঘাঁটা লপ্‌সী শোভন' করেছেন।···সুপার আর্সটনের চেহারাটা ছিলো লিক্‌লিকে, গায়ের রংটা ছিলো বিশ্রী রকমের সাদা। কবি একটা লাইনের ভিতর তাঁর অনবদ্য ভাষায় লিখেছিলেন 'ওল-ছোলা দেহ ধবল কুষ্ঠ'। যাঁরা তাকে দেখেছেন তাঁরা এর রসটা ভালো করেই নিতে পারবেন। এই গানটি শুনলেই সাহেব পুঙ্গব ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো কি করবে ঠিক করতে পারতো না।

'ভাঙার গানে' এই গানই আছে। তার ফুটনোট কবি এই কথা কয়টি লিখেছেন ঃ

'হুগলী জেলে কারারুদ্ধ থাকাকালীন জেলের সকল রকম জুলুম আমাদের উপর দিয়ে পরখ করে দেওয়া হয়েছিলো। সেই সময়

জেলের মূর্তিমান জুলুম বড়োকর্তাকে দেখে এই গান গেয়ে অভিনন্দন করতাম।'

কয়েদীরা খবরের কাগজ পড়ে তবু মনকে সান্ত্বনা দিতো কারণ বন্দীদের কাছে 'দৈনিক আনন্দবাজারের' কী যে কদর ছিলো এখনকার লোকদের তা বোঝানো অসম্ভব। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের (তখনকার 'আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন) বলিষ্ঠ সম্পাদকীয় স্তম্ভ ছিলো আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার স্টার্টার স্বরূপ। সহস্র বিপদ মাথায় করেও বিদ্যামন্দিরের স্বেচ্ছাসেবকরা জেলের মধ্যে উক্তপত্রিকাকে সরবরাহ করতো। সরবরাহ করতে গিয়ে ধরা পড়ে জেল ভোগও করছে অনেকে। বন্দুকধারী পুলিশ পাহারার চাপে শেষে কাগজ তো বন্ধ হলোই নিত্যব্যবহার্য সাবান-সোডা ইত্যাদিও বন্ধ হয়ে গেলো।

দেশভক্ত বন্দীদের প্রাণ হাঁপিয়ে উঠলো। সরকার মনোনীত পত্রিকাগুলোও বন্ধ করে দিলো আর্সটন। আগেই আহারের সম্বন্ধে বলেছি এবার বিহারের কথা বলবো। পূর্বে নতুন-নতুন এসে সকালে বিকালে জেলের উঠোনে, মাঠে বেড়াতে দিতো বন্দীদের কিন্তু পরে তাও বন্ধ করে দিয়ে বন্দীদের মধ্যে প্রাণবন্ত যারা ছিলো তাদের এক একটা ঘরে কোথাও দু'জনকে কোথাও একজনকে আটকে রেখে সমস্ত রকম অধিকার হরণ করে নিলো। বিহার মানে বেড়ানো বা বাইরে হাওয়া লাগানোও বন্ধ হয়ে গেলো; বন্দীর সঙ্গে বন্দীরা কথাও বলতে পারতেন না, তিনি গান ধরতেন ঃ

'কারার ঐ লৌহ কপাট।
ভেঙে ফেল্ কর রে লোপাট
রক্ত জমাট
শিকল পূজার পাষাণ বেদী

ওরে ও তরুণ ঈশান
বাজা তোর প্রলয় বিষাণ
ধ্বংস নিশান
উড়ুক প্রাচীর প্রাচীর ভেদী।'

গানটি শুনে বিক্ষুব্ধ বন্দীদের শিরদাঁড়া সোজা হয়ে উঠতো। তারা জেল কর্তৃপক্ষের এই অত্যাচারের উপযুক্ত জবাব দেবার জন্য প্রস্তুত হতো। কবি এবং আরো কয়েকজন বিশিষ্ট বন্দীকে হাত-কড়া ও পায়ে বেড়ি দিয়ে 'সেলে বন্দী করে অন্যান্য কয়েদী থেকে দূরে সরিয়ে রেখে দিলো। কবি তখন 'শিকল পরার গান' খানি রচনা করে হাত-কড়া সেলের লোহার গরাদের সঙ্গে ঘা দিয়ে বাজিয়ে গাইলেন ঃ

'এই শিকল পরা ছল্ মোদের এ শিকল পরা ছল্,
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করবো রে বিকল!
তোমার বন্দী করায় আসা মোদের বন্দী হতে নয়,
ওরে ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার বাঁধন ভয়,
এই বাঁধন পরেই বাঁধন ভয়কে করবো মোরা জয়,
এই শিকল বাঁধা পা নয় এ শিকল ভাঙা কল।

বন্দী জীবনে ভয়শূন্য হবার জন্য কবি অপূর্ব যুক্তিপূর্ণ কথাগুলো গানের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন। কাগজ নেই, কলম পেন্সিল—তাও নেই, কবি শূন্য হাতে শুধু স্মৃতিশক্তির জোরে এই সব গান শত বাধা সত্বেও রচনা সুর ও দরদ দিয়ে ভাবাবেগের সঙ্গে গেয়ে প্রতিকারের জন্য, প্রতিরোধের জন্য, উপযুক্ত প্রতিবাদের জন্য আগুনকে সংক্রামিত করে যেতে লাগলেন বন্দীদের প্রাণে প্রাণে। এই সময় বিখ্যাত 'সেবক' কবিতাটির রচনা করেন তিনি। উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করে বন্দীদের সংগ্রাম-শক্তি বাড়িয়ে তুলেছিলেন।

কবির সান্নিধ্যে এসে সাধারণ কয়েদীরা পর্যন্ত দেশকে ভক্তি করতে শিখেছিলো। তিনি লেখেন ঃ

'সত্যকে হায় হত্যা করে অত্যাচারীর খাঁড়ায়,
নাই কিরে সত্য-সেবক বুক ফুলিয়ে আজ দাঁড়ায় ?
শিকড়গুলো বিকল করে পায়ের তলায় মাড়ায়,
বজ্রহাতে জিন্দানের (জেলখানায়) এই ভিত্তিটাকে নাড়ায় ?

এই প্রশ্ন বারে বারে বন্দীদের কাছে তুলে ধরলেন কবি। ক্রমে জেলের অবস্থা ঘোরালো হয়ে উঠলো। যতরকম ফন্দী ছিলো, সকলের উপর প্রয়োগ করতে লাগলো জেলার আর জেল সুপার ? অনমনীয় বন্দীরা, অনমনীয় বিদ্রোহ কবি, অনমনীয় সাধারণ কয়েদীরাও। এরই প্রতিবাদের জন্য মিলিতভাবে সবাই অনশন ধর্মঘটের প্রস্তাব দৃঢ় সঙ্কল্পের সঙ্গে গ্রহণ করেন। ধীরে-ধীরে সকলে প্রস্তুতির দিকে এগিয়ে চলেন। এই সময় বোধহয় কবি নজরুল 'মরণ-বরণ' গানখানি রচনা করেন ঃ

'এসো এসো ওগো মরণ
এই মরণ-ভীতু মানুষ মেয়ের ভয় করো গো হরণ।
না বেরিয়েই পথে যারা পথের ভয়ে ঘরে
বন্ধ করা অন্ধকারে মরার আগেই মরে
তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ তাদের বুকে'র পরে
ভীম রুদ্রতালে নাচুক তোমার ভাঙন ভরা চরণ ॥

এই সময় 'বন্দী-বন্দনা' নামে একটি গান লেখেন। ভোর-বেলায় রাজনৈতিক বন্দীদের 'ফাইলে' দাঁড়াতে হতো। স্কুলে ড্রিলের সময় প্রথমে এসেই যেমন দাঁড়াতে হয় সেই রকম দাঁড়ানোকে ফাইল বলে। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, বন্দীদের রাম দুই করে হেড্ জমাদার গুনতো। গোণা হয়ে গেলে জেলর তার বিরাট ভুঁড়ি

ঝুলিয়ে মূর্তিমান নির্বোধের মতো সেখানে ঢুকতো। আর সঙ্গে-সঙ্গে জমাদার বীভৎস চীৎকার করে বলে উঠতো, 'সরকার সেলাম'। 'সরকার সেলাম'টা কবি ও অন্যান্য বন্ধুরা বরদাস্ত করতে পারতেন না। তাঁরা সঙ্গে-সঙ্গে একটি করে ঠ্যাং সামনের দিকে তুলে দিতেন। পরে এই নিয়ে অনেক মারপিট হয়ে গেছে।···ভোরবেলার এই ব্যাপারটির সঙ্গে উপরি-উক্ত 'বন্দী-বন্দনা' গানটির যোগাযোগে ছিলো। এই প্রভাতী গান গেয়ে কবি নজরুল সকলকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিতেন গানটি এই ঃ

'আজি রক্ত-নিশি ভোরে।
এ কি এ শুনি ওরে।
মুক্তি কোলাহল বন্দী শৃঙ্খলে,
ঐ কাহারা কারাবাসে
মুক্তি হাসি হাসে
টুটেছে ভয় বাধা স্বাধীন হিয়া তলে।
ওরা দু'পায়ে দলে গেলো মরণ শঙ্কারে,
সবারে ডেকে গেলো শিকল ঝঙ্কারে।
বাজিল নভ-তলে
বিজয়-সঙ্গীত বন্দী গেয়ে চলে,
বন্দীশালা ঝঞ্ঝা পড়ে ছেয়ে
উতল কলরোলে!
আজি করার সারা দেহে মুক্তি ক্রন্দন
ধ্বনিছে হা-হা স্বরে ছিঁড়িতে বন্ধন
নিখিল গেহ যথা বন্ধীকারা, সেথা
কেন রে কারাবাসে মরিবে বীর দলে?
'জয় হে বন্ধন' গাহিল তাই তারা
মুক্ত নভ-তলে।'

এর পর শুরু হতো অনশন ধর্মঘট। বন্দীরা জোর গলায় জানিয়ে দিলেন, সম্মানজক অবস্থা না হওয়া পর্যন্ত আমাদের চলা থামবে না। প্রথম-প্রথম এই ধর্মঘটের কথা বাইরে প্রকাশ হয়নি। তারপর চরমে পৌঁছালো। কর্তৃপক্ষ আর আঁচল দিয়ে আগুন চেপে রাখতে পারলো না। সেই আগুন ছড়িয়ে গেলো সবখানে। এই অনশন ধর্মঘট নিয়ে সারা বাংলাদেশে ও নিখিল ভারতের নরম-চরম-পন্থী নেতারা, ছাত্র যুবকরা এমন কি সাধারণ লোকেরাও ভীষণভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। এমন কি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও খুবই বিচলিত হয়েছিলেন। কবি নিজে সৈনিক পুরুষ, একরোখা লোক, যা করবেন তা করবেনই, কিছুতেই রোখা যেতো না! এই অনশনের সময় সমস্ত বন্দীরাই অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। হাত-পা-মাথা চেপে ধরে চামুণ্ডার দল জোর করে নল দিয়ে খাওয়ানোর জন্যেই বেশীর ভাগ বন্দীরা দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন, শুধু তাই নয় কারুর জীবনসংশয়ও হয়েছিলো। সকল বন্দীর জন্য বিশেষ করে বিদ্রোহী কবির জন্য দেশবাসী উদ্বেগ অধীন হয়ে ওঠে। সভাসমিতি, প্রস্তাব পাশ - নানারকম চেষ্টা চলতে থাকে। কবিকে দেশের বড়ো -- বড়ো নেতারা অনশন ত্যাগের অনুরোধ করে পাঠান। কবি 'মরণ-বরণ' গান লিখে সকলকে মৃত্যু ভয়শূন্যে হয়ে অনশনের পথে ডেকেছেন, তিনি হয় সকলকে নিয়ে মরবেন, নয় সকলকে নিয়েই সাফল্যের মধ্য দিয়ে অনশন ত্যাগ করবেন—এই তাঁর জিদ। পরে স্বয়ং বিশ্বকবি তারবার্তায় জানালেন "Give up hunger strik, our literature claims you—Rabindranath."

এবার কবি একটু বিচলিত হলেন। কবি নজরুলের বাংলা সাহিত্যের জন্য এবং ভারতের ভবিষ্যতের জন্য বেঁচে থাকা দরকার এ-কথা বিশ্বকবি স্বীকার করলেও তৎকালীন অন্যান্য সাহিত্যিকরা স্বীকার না করে দেশসেবকদের কাছে হেয় হয়েই আছেন। এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বসন্ত' নাটকখানি কবি নজরুলকে উৎসর্গ

করেন, এবং নজরুল-বন্ধু শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে দিয়ে হুগলী জেলে পাঠিয়ে দেন। পুস্তকখানি নিয়ে পবিত্রবাবু হুগলীতে আসেন।

পবিত্রবাবুর হাত থেকে 'বসন্ত' নাটকখানি হাতে নিয়ে নজরুল দেখলেন, কবিগুরু বসন্ত নাটকের উৎসর্গ পৃষ্ঠায় ছাপা অক্ষরে শ্রীমান কবি কাজি নজরুল ইসলাম, কল্যাণীয়েষু' লিখে নীচে তাঁর নামকালি দিয়ে সই করেছেন।

কবি নজরুল বিশ্বকবির তারবার্তা ও 'বসন্ত' নাটকসহ আশীর্বাদ পেয়ে একটু চিন্তিত হলেন। জেলের সাথীরাও মাঝপথে থমকে দাঁড়ালেন—অবশ্য অনশন-ধর্মঘট চালু রেখে। এমন সময় বাইরের আন্দোলনের চাপে ও রবীন্দ্রনাথের হস্তক্ষেপে বন্দীদের দাবী মেনে নেবে বলে সরকার স্বীকার করলো। তখনও চির-অবিশ্বাস বৃটিশ সরকারকে বন্দীরা বিশ্বাস করতে পারলেন না! অনশন ধর্মঘট চলছে, এমন সময় একদিন কলকাতা থেকে পবিত্রবাবুর সঙ্গে বিরজাসুন্দরী দেবী, গায়ক নলিনীকান্ত সরকার, কবি সুবোধ রায়, হুগলী বালির ৺চারুশীলা মিত্র প্রভৃতি হুগলী জেলের গেটে এসে উপস্থিত হলেন। বিরজাসুন্দরী দেবীকে কবি মা বলে ডাকতেন। 'সর্বহারা' নামক শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থখানি কবি উৎসর্গ করেছিলেন এঁকে। তাতে লিখেছিলেন ঃ

> 'সর্বংসহা সর্বহারা জননী আমার!
> তুমি কোনদিন কারো করোনি বিচার,
> কারেও দাওনি দোষ। ব্যাথা-বারিধির
> কূলে বসে কাঁদো মৌনা কন্যা ধরণীর
> একাকিনী! যেন কোন্ পথ-ভুলে আসা
> ভিন্-গাঁর ভীরু মেয়ে—কেবলি জিজ্ঞাসা
> করিতেছ আপনারে, 'এ আমি কোথায়?—

বিশ্বকবির তারবার্তায় ও বিরজাসুন্দরীর বহু সাধ্য সাধনায় এবং সরকার পক্ষের দাবী মিটাবার স্বীকৃতিতে মায়ের হাতে লেবুর রস

পান করে কবি নজরুল অনশন ভঙ্গ করলেন।

অনশন ভঙ্গ হবার পর কর্তৃপক্ষ বন্দীদের সমস্ত দাবীই মিটিয়ে দিলো, কিন্তু সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠা কেটে তারপর পড়তে দিতো।

এরপর কবি নজরুল বহরমপুর জেলে বদলি হয়ে যান। কবি উক্ত জেলে যেতেই জেল স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীবসন্ত ভৌমিক একটি হারমোনিয়াম তাঁকে পাঠিয়ে দেন। হারমোনিয়াম পেয়ে নজরুলের আনন্দ আর ধরে না। নাওয়া খাওয়া ভুলে দিনরাতই প্রায় গান গাইতেন, আর মনের স্থখে কবিতা, প্রবন্ধ লিখতেন। হুগলী জেলের সংগ্রামের পর নজরুল বহরমপুরে আনন্দেই ছিলেন।

গোলাম মজদ্দুর

গ্রামোফোন ক্লাবে বাংলা ডিপার্টমেণ্টের বড়ো-কর্তা ছিলেন ভগবতী চরণ ভট্টাচার্য। সবাই তাকে ডাকত বড়োবাবু বলে। একদিন নলিনী সরকার নামে এক ভদ্রলোক এসে বড়োবাবুর হাতে একখানা গানের খাতা দিয়ে বললে, 'দেখুন তো এই বাংলা গজল গানগুলি রেকর্ড করা যায় কিনা?'

বড়োবাবু প্রশ্ন করলেন, 'কে লিখেছে?'

'কাজী নজরুল ইসলাম।'

বড়োবাবু কে, মল্লিককে ডাকলেন, 'দখুন তো এই খাতাখানা। আর এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলুন।'

কে. মল্লিক খাতা পড়ে দেখলো গজল ছাড়া অন্য গানও আছে। ওর মধ্য থেকে দু'খানা গান সে লিখে নিলো। বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিস্‌নে আজি দোলা।' আর 'আমারে চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী।' খাতাটা নলিনী সরকারের হাতে ফেরত দিয়ে বললো, 'এ দু'খানার বাজার দেখে তারপর অন্য গান নেওয়া যাবে।'

এই গান দু'খানার রেকর্ড যখন বাজারে বেরুল তখন প্রায় এক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলো। বড়োবাবু কে, মল্লিককে ডেকে বললেন, 'যাক,

একটা নতুন লাইন পাওয়া গেল। এতদ্দিন কেবল তুমি দেহতত্ব, ভজন, শ্যামা সঙ্গীত গেয়েই কাল কাটালে। এবার দেখা যাক্ কি হয়।'

'আর একটু স্পষ্ট করে বলুন।'

'কাজী সাহেবকে আনিয়ে আরও গান নাও না।'

কে, মল্লিক কাজী নজরুলকে গ্রামোফোন ক্লাবে নিয়ে এলো সেখানে কোম্পানীর পরামর্শ অনুযায়ী সুরু হলো তাঁর গান লেখা : বিদোহের রণ-দাদামা এখানে বাজানো যাবে না। ঝাঁঝালো স্বদেশী গান এখানে চলবে না বৃটিশ কোম্পানীর আওতায় এ-সব বাদ দিয়ে লিখতে হবে গান, যাতে শুধু পয়সা আছে! ধর্মীয় গানে একদম কারো আপত্তি নেই। আর মানুষ তো এদেশে ধর্ম-প্রবণ। অন্যান্য গানের সঙ্গে তাই একই লেখনী দিয়ে বেরুতে লাগলো দেব-দেবীর উপাসনা, নমাজ, পীর-পয়গম্বরের গান। এতদিন হিন্দু-সঙ্গীত দিয়ে মুনাফা হচ্ছিলো। এখন ইসলামী সঙ্গীত দিয়ে আরো একটি বুড়ো বাজার দখল করবার চেষ্টা করলো বৃটিশ কোম্পানী। কাজী নজরুল দু'য়েরই যোগান দিয়ে চললেন অপূর্ব প্রতিভা নিয়ে। এখন তিনি দু'বেলা আসতে লাগলেন গ্রামোফোন ক্লাবে। কে. মল্লিকের কণ্ঠে বেজে উঠলো কাজী নজরুলের প্রথম যুগের অনেক জনপ্রিয় গান। ফলে কে, মল্লিকের জনপ্রিয়তা যেন দেখা দিলো নতুন করে।

এমন সময় তাকে একদিন এসে ধরলো তার এক দেশের লোক বললো, আপনার তো নামডাক খুব, আমাকে একটু উঠতে দেবেন?

'তার মানে?'

দেখুন, খুন মল্লিকবাবু আপনি কালনার লোক, আমার বাড়ী কাটোয়ায় এক দেশের লোক বললেই হয়—উঠতে দেবেন আমাকে?'

কে, মল্লিক হাসি চেপে বললো, 'আপনি আমার দেশের লোক,

আপনি উপরে উঠলে তো খুশির কথা। কী নাম আপনার ?'

'প্রফেসর জি, দাস। দেখুন দেশের লোকই দেশের লোককে উঠতে দেয় কিনা।'

মল্লিক বললো, কিন্তু দেখুন, আমাদের গান দেওয়ার আগে একটু পরীক্ষা করতে হয়।'

উত্তর এলো, বেশ দেবো পরীক্ষা।'

প্রফেসর জি, দাসের পরীক্ষা নেওয়া হ'লে। একবারেই অচল কথাটা শুনে প্রোফেসর জি দাস ঠিক হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো। কে, মল্লিক যতই সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে—'একদিন হবেই।' ততই সে দ্বিগুণ কান্নার আবেগ ফুলে-ফুলে উঠে বলতে লাগলো, আমি অঙুরবালাকে মা বলেছি, ইন্দুবালাকে মাসি বলেছি আর আমাকে কিনা'—

কথাটা শেষ না করেই প্রফেসর জি, দাস আবার কাঁদতে লাগলেন। তখন বড়োবাবু এসে বললেন, 'কী ব্যাপার ?

প্রফেসর জি, দাস চোখ মুছে বললেন, 'রেকর্ডে নাকি আমার গান গাওয়া হবে না ?'

বড়োবাবু জবাব দিলেন, 'এখনও তোমার গান ভালো হচ্ছে না, সুরে তাল ঠিক থাকছে না।'

হঠাৎ প্রফেসর জি, দাস প্রশ্ন করলেন, 'তবে কী আমার সীতাভোগ-মিহিদানা খাওয়ানো ব্যর্থ হলো ?

বড়ো বাবু অবাক হয়ে শুধোলেন, 'কে তোমার মিষ্টি খেয়েছে ?'

উত্তর এলো, বীরেনবাবু আর কমলবাবু। কে মল্লিক আমাকে হিংসে করে গান গাইতে দিচ্ছে না, ওরা আমাকে বলেছে।'

বড়োবাবু হেসে ফেললেন। এই বোকা লোকটাকে ঠকিয়ে ওরা মিষ্টি খেয়েছে কে মল্লিকের ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে দিয়েছে মজা দেখার জন্যে।

এমন সময় কাজী নজরুল এসে ঢুকলেন ঘরে। প্রফেসর বলেই

যাচ্ছে, 'ওরা আমাকে কথা দিয়েছিলো একখানি রেকর্ড অন্ততঃ হবেই, আজ কিনা বলে কিছু হবে না।'

কাজী নজরুল সব শুনে বললেন, 'দেখুন, মল্লিক এঁকে যখন একখানা রেকর্ড নেওয়ার কথা দেওয়া হয়েছে তখন সে কথা রাখতেই হবে।'

মল্লিক বললো, 'বলেন কি, লোকটা পাগল দেখছেন না।'

'কিন্তু বাংলা দেশটাও কম হুজুগে নয় মল্লিক, বললেন কাজী নজরুল। তারপর প্রফেসরের দিকে ফিরে বললেন, তুমি আজ যাও, কাল এসো—আমি তোমাকে শিখিয়ে রেকর্ড করবো।'

জি, দাস একগাল হেসে চলে গেলো ; পরদিন কাজী নজরুল দেখেন অনেক আগেই প্রফেসর হাজির। তাকে বললেন, 'মল্লিককে ডেকে আনো।'

প্রফেসর জবাব দিলো, 'কাজী সাহেব, মল্লিক আমার শত্রু। আমার গান খারাপ করে দেবে।'

কাজী নজরুল আশ্বাস দিলেন, জানো 'না, কে, মল্লিক খুব ভালো লোক। তোমার সঙ্গে কেমন সুন্দর হারমনিয়াম বাজাবে দেখো!'

কে, মল্লিক ঘরে ঢুকতেই কাজী নজরুল বললেন, 'আসুন মল্লিক সাহেব। আর. জি. দাস কপাটে খিল এঁটে দাও। তার আগে তবলাওয়ালাকে ডাকো।

ঘরে রইলো তখন চারজন।

কাজী নজরুল বললেন, 'শোনো জি. দাস কেউ যদি জিজ্ঞেস করে কী গাইবে, কিছুই বলবে না। খুব সাবধান। বাজারে রেকর্ড বের হলে তখন শুনবে।'

জি. দাস সানন্দে মাথা ঝাঁকিয়ে বললে, না কাউকে আগে শোনাবো না!'

কাজী নজরুল বললেন, 'আচ্ছা, তাহলে ধরো এইবার গান ঃ

'কলগাড়ী যায় ভষড় ভষড়'
ছ্যাক্‌রা গাড়ী যায় খচাং খচ্
ইচিং বিচিং জমাই চিচিং
কুলকুখি দেয় করে ফচ্ ।

পরের দিন কাজী নজরুল এই গানের জোড়া লিখে আনলেন ঃ

মরি হায় হায় হায়
কুব্‌জার কী রুপের বাহাব দেখো ।
তারে চিৎ করলে হয় যে ডোঙা ॥
উপুড় করলে হয় সাঁকে ।
হরি ঘোষের চার নম্বর খুঁটো
মরি হায় হায় হায় ।

প্রফেসরকে চতুষ্পদ বানানো হচ্ছে তাও সে বুঝলে না। খুব উৎসাহে চলতে লাগলো রিহার্সেল। রেকর্ডিং ম্যানেজারকে বলা হলো কী গান রেকর্ড করা হচ্ছে। আর সে সাহেব বাংলা প্রায় বোঝেই না। কাজেই কেউ হঠাৎ টের পেয়ে বাধাও দিতে পারলো না। খুব গোপনেই গান দুখানা রেকর্ড হলো। কয়েকদিন পর বেরুলো বাজারে।

কাজী এসে বললেন, মল্লিক, দেখুন তো একবার বাজারে খোঁজ নিয়ে।'

'খোঁজ নিয়েছি! খুব বিক্রি। খদ্দেররা কিনছে আর বলছে, কলগাড়ী যায় ভষড ভষড়।'

হিগিন্‌স তো ভীষণ খুশি। বড়বাবুকে ডেকে বললো, 'ভটচায! তুমি বলো লোকটা ক্ষ্যাপা। বেশ তো সেল হচ্ছে! আরও গান নাও।'

শুনে কাজী নজরুল বললেন, 'মল্লিক সাহেব. এবার কিন্তু গালাগাল খেতে হবে। হুজুগে দেশে ওরকম একবারই চলে।'

ক্রমে ক্রমে কাজী নজরুলের সঙ্গে কে. মল্লিকের সম্পর্কটা অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলো।

সমাপ্ত